PAKA MAJAR
O
WASILAR TOTTOSAR

পাকা মাযার ও ওয়াসীলার তত্ত্বসার

অধ্যাপক মাওলানা হাফিয শাইখ আইনুল বারী আলীয়াভী

বিস্‌মিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে শুনাতে পারেন। কিন্তু তুমি শুনাতে পারবে না তাদেরকে যারা ক্ববরগুলোতে আছে।" -সূরা ঃ আল-ফাতির- ২২ আয়াত।

পাকা মাযার ও ওয়াসীলার তত্ত্বসার

মাওলানা হাফিয শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী

অধ্যাপক

কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা

এম.এম. ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট (রেকর্ড, প্রাইজ ও স্কলারশিপ প্রাপ্ত), কলিকাতা

ডিপ ইন উর্দূ ফার্স্ট ডিভিশন, ফার্স্ট রেকর্ড, স্টাইপেন প্রাপ্ত

এম.এ. (আলীগড়)

ভূমিকা

ইসলাম ধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং অনন্য বৈশিষ্ট্য তাওহীদ বা একত্ববাদ। এরই বিপরীত শির্ক তথা বহুত্ববাদ। শির্কের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ان الشرك لظلم عظيم *

"শির্ক নিশ্চয়ই মহা অত্যাচার।" (সূরা ঃ লুকমান– ১৩ আয়াত)

আর শির্ককারী সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة *

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করে তার জন্য আল্লাহ জান্নাতকে অবশ্যই হারাম করে দেন।" (সূরা ঃ আল-মায়িদাহ্– ৭২ আয়াত)

ইসলামী তাওহীদের ঘোরশত্রু শির্কের বিভিন্ন কারণের একটি কারণ অলী-আল্লাহদের ক্ববর পাকাকরণ এবং ঐ ক্ববরগুলোর মাযার (দুনইয়াদার দর্শনার্থীদের দর্শনক্ষেত্র) হওয়ার রূপধারণ। কোন মুসলিম সাধকের ক্ববর পাকা করলে তা পরে চাকচিক্যময় মাযারে পরিণত হয় এবং কোথাও তা শির্কের আধারও হয়ে যায়। তাই পাকা মাযারের ক্ষতি সম্পর্কে সাধারণ জনগণের সামনে ইসলামী বিধিনিষেধ তুলে ধরা একান্ত দরকার। এই অত্যন্ত দরকারী বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের তথ্যে এবং প্রচলিত মাযহাবী ফিক্হ ও ইসলামী ইতিহাসের বরাত দিয়ে বই-আকারে বাংলা ভাষায় উল্লেখযোগ্য কোন বই লেখা হয়নি। বাংলা সাহিত্যের উক্ত অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে এবং তাওহীদ-বাদীদেরকে শির্কের মোহজাল থেকে বাঁচানোর নিমিত্তে এই বইটি লেখা হল। ১১৩টি গ্রন্থ ঘেঁটে পুস্তকটি প্রণয়ন করা হল এবং সমস্ত বইয়ের প্রমাণপঞ্জী বইয়ের শেষে দেয়া হল। এর কোন তথ্য কারো নযরে ভুল প্রমাণিত হলে তিনি তা প্রমাণসহ ধরিয়ে দিলে বাধিত হব এবং পরবর্তীতে তা সংশোধন করে দেব ইন্শাআল্লাহ। মুশরিকী ধ্যানধারণায় নিমজ্জিত কোন একজন ব্যক্তিও যদি এই বইটি পড়ে তাঁর শির্কীয়া ধারণা থেকে মুক্ত হতে পারেন তাহলে আমার এই মেহনত সার্থক হবে– ইন্শাআল্লাহ।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে শির্ক থেকে বাঁচার এবং তাওহীদী 'আক্বীদায় অটল থাকার তাওফীক্ব দিন– আমীন!

তাওহীদবাদীদের দু'আর আশাধারী
শেখ আইনুল বারী

দ্বিতীয় সংস্করণে লেখকের ভূমিকা

আল্লাহর অশেষ প্রশংসা যে, প্রায় ছয় বছর পর বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ পেল। এই বইটি প্রকাশিত হবার তিন বছরের মধ্যেই এর তথ্যগুলো কিছু আল্লাহর বান্দাকে এত মুগ্ধ করে যে, তারা এটাকে উর্দুতে অনুবাদ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। অতঃপর মালদাহ জেলার মাওলানা আব্দুল লতীফ নাদভী সাহেব এটাকে উর্দুতে তরজমা করে বোম্বাইয়ের "স্বওতুল ইসলাম" পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশ করেন। তারপর আমার সংশোধনীর পরে ২০০০ ঈসায়ী সালের জুলাই মাসে "পোখতাহ্ মাযার আওর ইসলাম" নামে উর্দুতে বই আকারে তিনি এটাকে প্রকাশ করেন।

ইতোমধ্যে বাংলা ও উর্দুভাষী মহল থেকে কয়েকটি রিপোর্টে জানা যায় যে, কতিপয় পাকা মাযারভক্ত ভাই ও বোন অত্র পুস্তকটি পড়ে মাযার সংক্রান্ত শির্ক ও বিদ'আত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন– আল্লাহরই সকল প্রশংসা।

অতঃপর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার জয়নগর এলাকায় ঢোলাহাটে এক মৃত ফকীর সাহেবের ক্ববর পাকা না করার ওয়াসিয়্যাত থাকা সত্ত্বেও তাঁর ক্ববর পাকা করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। ফলে ২৯ ডিসেম্বর ২০০২ ঈসায়ী রবিবারে ক্ববর পাকা হবে, কি না হবে, বিষয়ে ঢোলাহাট স্কুলে এক আলোচনা বৈঠক হয়। তাতে আমিও ছিলাম। তারপরেই অত্র পুস্তকটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা অপরিহার্য মনে হয়। তাই এটা আবার ছাপানো হলো। এই দ্বিতীয় প্রকাশে আরো ৭টি গ্রন্থ যাচাই বাছাই করে ওয়াসীলা সংক্রান্ত তথ্যগুলো সংযোজিত হল। সেই সাথে এর নাম "পাকা মাযার ও ওয়াসীলার তত্ত্বসার" রাখা হল। আল্লাহ এটাকে ক্ববূল করুন– আমীন।

ইতি
শেষ নাবীর শাফা'আতের আশাধারী
শেখ আইনুল বারী

তাং- ১৫ই মে ২০০৩ইং
১২ই রবীউল আউঅল
১৪২৪ হিজরী

সূচীপত্র

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

ক্বর যিয়ারতের নিয়ম ও দু'আ

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্বর যিয়ারতের সময় নিম্নের দু'আগুলো পড়েছিলেন ঃ

السـلام عليكم أهل الديار، من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شـاء الله بكم لاحقون أنسأل الله لنا ولكم العافية *

বাংলা উচ্চারণ– আস্‌সালা-মু 'আলাইকুম আহ্‌লাদ্ দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা' অলমুস্ লিমীন ০ অইন্না ইন্‌শা-আল্লা-হু বিকুম লা-হিক্বূন ০ নাসআলুল্লা-হা লানা-অলাকুমুল আ-ফিয়াহ্।

অর্থাৎ– হে (নির্জন) ঘরবাসী মু'মিন ও মুসলিমগণ! আপনাদের উপরে আল্লাহর রাহমাত বর্ষিত হোক। আর আমরা ইন্‌শাআল্লাহ (আল্লাহ যদি চান) আপনাদের সাথে মিলিত হচ্ছি। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য ও আপনাদের জন্য নিরাপত্তা কামনা করছি। (মুসলিম, মিশকাত– ১৫৪ পৃষ্ঠা)

ইবনু 'আব্বাস বলেন, একদিন নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদীনার ক্বরগুলোর পাশ দিয়ে গেলেন। তখন তিনি ক্বরবাসীদের দিকে মুখ করলেন। অতঃপর বললেন–

বাংলা উচ্চারণ– আস্ সালা-মু 'আলাইকুম ইয়া-আহ্‌লাল ক্বূরি ইয়াগফিরুল্লা-হু লানা অলাকুম ০ ওয়া আন্‌তুম সালাফুনা অনাহ্‌নু বিল আসারি।

অর্থাৎ– হে ক্বরবাসী! আপনাদের উপরে আল্লাহর রাহমাত বর্ষিত হোক। আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে ক্ষমা করুন। আপনারা আমাদের অগ্রবর্তী আর আমরা আপনাদের পরবর্তী।

দ্বিতীয় হাদীসটির বর্ণনা অনুসারে ক্বর যিয়ারতের সময় ক্বরবাসীর দিকে মুখ করে ক্বর যিয়ারতের দু'আ পড়তে হবে। ফলে যিয়ারতকারীর পিঠটা ক্বিবলার দিকে থাকবে। যিয়ারতের দু'আ পড়ার সময় হাত তুলতে হবে কিংবা হাত বেঁধে তা পড়তে হবে– এমন কোন পরিষ্কার বিধান হাদীসে নেই।

তেমনি ক্বর যিয়ারতের জন্য কোন নির্দিষ্ট দিন কিংবা নির্দিষ্ট রাত অথবা নির্দিষ্ট ক্ষণের প্রমাণ কোন হাদীস দ্বারা পাওয়া যায় না। তাই ১৫ শা'বানের নির্দিষ্ট

রাতে দল বেঁধে গোরস্থান বা ক্ববরস্থান যিয়ারত করা এবং সারা বছর ক্ববর যিয়ারত না করা মনগড়া বিধান। কিছু লোককে জিয়াফত বা দাওয়াত খাইয়ে নিজ পিতা-মাতার কিংবা কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের ক্ববর যিয়ারত দলবেঁধে করানোর প্রমাণও হাদীসে নেই। একটি নির্দিষ্ট দিনে কোন বুযুর্গ ব্যক্তির মাযার দলবেঁধে যিয়ারত করানোর প্রমাণও হাদীসে নেই। একটি নির্দিষ্ট দিনে কোন বুযুর্গ ব্যক্তির মাযার দলবেঁধে যিয়ারত করলে পরবর্তী কালে তা মেলায় পরিণত হতে পারে। মহানাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ববর যাতে ঈদ বা বার্ষিক মেলায় পরিণত না হয় তার জন্য তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করেছিলেন– (আবূ দাউদ– ১ম খণ্ড ২৭৯ পৃষ্ঠা)। ফলে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দু'আর বারকাতে আল্লাহর রাহমাতে তাঁর ক্ববরে বার্ষিক মেলারূপী উরস হয় না।

কোন ক্ববর বার্ষিক মেলার রূপধারণ করে উরসের মাধ্যমে। এই উরস ইসলামী মতে বৈধ কিনা তা আমাদের জানা একান্ত উচিত। তাই এবার উরস সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

উরস শব্দের অর্থ ও পারিভাষিক ভাবার্থ

আরবী ع (আইন), ر (র), س (সীন) অক্ষরের সমষ্টি উরস শব্দটি। উরস শব্দের অর্থ বাসর রাতের মিলন– (আল-কামূস– ২য় খণ্ড ১২৩ পৃষ্ঠা), অলীমার খানা ও খুশী প্রভৃতি। (মিসবাহুল লুগাত– ৫২০ পৃষ্ঠা)

কিছু লোকের পরিভাষায় উরস বলা হয়– কোন বুযুর্গ ব্যক্তির মাযারে তাঁর মৃত্যুদিবস পালনের নামে ধর্মীয় জলসার আয়োজন করা এবং তাঁর ভক্ত জনগণের ভিড়ে তথায় একটি মেলার রূপধারণ করা। আলকুরআনের কোথাও উরস শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। কিন্তু হাদীসে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে বাসর রাতের মিলন অর্থে। যেমন বিখ্যাত সহাবী আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ)-এর বর্ণনায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ববরের বর্ণনা দিতে গিয়ে মালাইকাগণের মুখ দিয়ে নেক্কার লোকদেরকে বলেন, "নাম কা-নাওমাতিল আরূস" অর্থাৎ– "তুমি বাসর রাতের বর-কনের ঘুমের ন্যায় ঘুমাও।" (তিরমিযী, মিশকাত– ২৫ পৃষ্ঠা)

উরস ভক্ত ও উরসের প্রতি বীতশ্রদ্ধ সবাই এ কথা স্বীকার করেন যে, ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের নিকট সবচেয়ে বেশী ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র আল্লাহর পরে তাঁরই শেষনাবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মুসলমানদের চরম ও পরম ভক্তির এই পাত্র রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তিরোধানের নামে কোন উরস কখনই পালন করা হয় না।

মহানাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর মুসলমানদের কাছে অতিভক্তির পাত্র তাঁর চারজন মহামান্য খলীফা। তাঁরা হলেন, আবূ বাক্‌র সিদ্দীক ও 'উমার ফারূক এবং 'উসমান গনী ও 'আলী কার্‌রামাল্লাহু অজ্‌হাহু (রাযিঃ)। এঁদের কারো নামেও উরস পালন করা হয় না।

এঁদের পরে মুসলমানদের অতিভক্তির পাত্র সহাবায়ি কিরাম। যাঁদের মাহাত্ম্য সম্পর্কে আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)-এর বর্ণনায় নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আমার সহাবীদেরকে গালি দিও না। কারণ, তোমাদের কেউ যদি (তিন মাইল লম্বা) উহুদ পাহাড় সমান সোনা দান করে তথাপি সে তাঁদের একজনের এক মুদ্দ (প্রায় এক কিলোগ্রাম) সোনা (দান করার) পর্যায়েও পৌঁছতে পারবে না এবং ওর অর্ধেকও না। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত– ৫৫৩ পৃষ্ঠা)

মহানাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের সময় তাঁর সহাবায়ি কিরাম ছিলেন, একলক্ষ চোদ্দহাজার (উলুমূল হাদীস– ২৬৮ পৃষ্ঠা)। উক্ত সমস্ত মাননীয় সহাবীগণের মৃত্যুর নাম করে কোনরকমই উরস পালন করা হয় না। সহাবী ইমরান ইবনু হুসাইনের বর্ণনায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘোষণায় সহাবায়ি কিরামের পর উম্মাতে মুহাম্মাদীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ তাবিঈনে ইযাম। (বুখারী, মুসলিমে বর্ণিত হাদীসের ভাবার্থ, মিশকাত– ৫৫৩ পৃষ্ঠা)

উক্ত তাবিঈগণ সংখ্যায় কয়েক লক্ষ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সুফী ও খানকাহ্‌ওয়ালারা যাঁকে নিজেদের শিরোমণি ভাবেন তিনি হলেন হাসান বাসরী (রহঃ)। উক্ত সমস্ত শ্রদ্ধাভাজনদের কারো নামে বার্ষিক উরস পালিত হয় না। তাবিঈদের পরেও কয়েকশো বছর ধরে ইসলামী সমাজে উরসের চাল ছিল না।

উরসের উৎস

তাবা-তাবিঈদের পরবর্তী যুগে মুসলমানগণ যখন ইসলামী শিক্ষা থেকে দূরে সরে যায় এবং মুশরিকদের সাথে মেলামেশার সুযোগ পায় তখন তাদের সাহচর্যে অজ্ঞ মুসলমানদের মধ্যে কিছু মুশরিকী ধ্যানধারণা ও কার্যাবলী স্থান পায়। তারপর থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্নরূপ শির্কের প্রচলন দেখা যায়। তন্মধ্যে একটি হলো, স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে প্রেমের প্রকাশ। এই প্রেমের প্রকাশ তিনভাবে পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমতঃ তাদের ধারণা এই ছিল যে, পিতা ও পুত্রের মধ্যে যে ভালবাসা থাকে ঐরূপ ভালবাসা আল্লাহ ও তাঁর কিছু প্রিয় দাসের মধ্যে হয়ে থাকে। ঐ ধারণার বশবর্তী হয়ে আল্লাহর প্রিয় দাসকে তাঁর পুত্র বানিয়ে দেয়া হয়। তারপর

তাকে আল্লাহর সমস্ত রকম ক্ষমতার অধিকারী বানিয়ে তাকে দেবতায় পরিণত করা হয়। পরিশেষে তার পূজাপাঠও শুরু করে দেয়া হয়। যেমন ইয়াহুদীরা উযাইর নাবীকে এবং খৃষ্টানরা ঈসা বিন মারীয়াম (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বানিয়ে নিয়েছে।
(সূরা ঃ আত্-তাওবাহ্– ৩০ আয়াত)

দ্বিতীয়তঃ এক মা ও তার সন্তানদের মধ্যে যে ভালবাসা থাকে ঐরূপ ভালবাসা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে তৈরী করতঃ কিছু মহিয়সী নারীর মধ্যে ঐ ভালবাসার প্রকাশটা মেনে নিয়ে তাদেরকে দেবী বানিয়ে দেয়া হয়। যেমন দূর্গা, পার্বতী, লক্ষ্মী, সর-স্বতী দেবীদের পূজা করা হয়।

তৃতীয়তঃ বর ও কনে এবং স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যে প্রেম থাকে ঐরূপ প্রেম আল্লাহ এবং মানুষের মধ্যে তৈরী করতঃ কিছু কুমারী নারীকে বিভিন্ন উপাসনালয়ে অক্‌ফ করে দেয়া হয়। তারা সারাজীবন বিয়েই করে না। যেমন কিছু মন্দিরের দেবদাসী এবং গির্জার নান্‌গণ। তাদের অবিবাহিতা থাকাটাই তাদেরকে ঈশ্বরের প্রিয়পাত্রী বানিয়ে দেয়। ফলে তাদেরকে ঐশ্বরিক পবিত্রতা ও উপাস্যের মর্যাদা দেয়া হয়। যেমন দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন মন্দিরে আজও দেবদাসী প্রথা চালু রয়েছে।

মুসলিমদের মধ্যে উরসের প্রচলন

উক্ত তৃতীয় ধারণাটি মুসলমানদের মধ্যে এসে যায়। ফলে আত্মাভোলা কিছু ফকীরের উদ্ভব হয়। যারা নারীদের মত রংবেরং কাপড় পরে এবং হাতে ও পায়ে চুড়ি ও বেড়ি পরে মেয়েদের মত নেচে নেচে তাদের মিয়া অর্থাৎ আল্লাহকে রাযী করাতে থাকে। এই ধারণাটা পরে উন্নতি করতে করতে বুযুর্গদের মৃত্যুদিবসকে উরসের দিন তথা খুশির দিন কিংবা প্রেমিকের মিলনের দিন বানিয়ে দেয়। অর্থাৎ ওফাত পেয়ে ঐসব বুযুর্গরা তাঁদের প্রেমিক আল্লাহ মিয়ার ঘরে পৌঁছে গেছেন। এই দিক দিয়ে তাঁদের ওফাতের দিনটা যেন তাঁদের বিয়ের দিন কিংবা প্রেমাস্পদের সাথে মিলনের দিন। তাই তাঁদের মৃত্যুদিবসটাকে উরস (খুশি) নামে অভিহিত করে ঐদিনে সেইসব কাজ করা হয় যা বিয়ের সময় করা হয়ে থাকে। উরসের দিনে কিছু বুযুর্গের মাযারকে গোসল দেয়া হয় এবং রেশমের চাদর ঐসব মাযারে চড়ানো হয়। কোন কোন মাযারে মেহেন্দীর রংও লাগানো হয়। তারপর তাবার্‌রুকের নাম করে সেখানে মিষ্টি বিতরণ করা হয় এবং লঙ্গরখানাও চালু করা হয়। সেখানে সালামীর নামে মান্নত চড়ানো হয় ও কৃবরগুলোকে চুমো খাওয়া ও তাতে ফুলের মালা ও হারও পরানো হয়। এটাই হল উরসের প্রকৃতি। যার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ এথেকে আমাদেরকে বাঁচান– আমীন!

উরসের কারবার ও মাযার

সবরকম উরস কোন না কোন বুযুর্গ ও পীরের ক্ববরকে কেন্দ্র করেই হয়। কিছু লোক ঐ ক্ববরকে যিয়ারত করতে যায়। কেউ কেউ ওখানে কি তামাশা হয় তা দেখতে যায়। আবার মুর্খ ও জাহিলরা ঐ মৃত বুযুর্গকে কোন 'বাবা' নাম দিয়ে তাঁর কাছে কিছু চাইতে ঐ ক্ববরের দর্শনে যায়। ফলে ঐরূপ বুযুর্গদের ক্ববরগুলো দর্শন ও পরিদর্শনের ক্ষেত্রে পরিণত হয়।

আরবীতে পরিদর্শন ক্ষেত্রকে– 'মাযার' বলা হয়। তাই উরসওয়ালাদের কারবার ক্ষেত্রটি অজ্ঞ জনগণের কাছে মাযার নামে প্রসিদ্ধ ও বহুল পরিচিত। বিভিন্ন হাদীসে 'ক্ববর' যিয়ারতের কথা আছে– (মুসলিম, মিশকাত– ১৫৪ পৃষ্ঠা)। কিন্তু তাতে কোথাও– 'মাযার যিয়ারত' শব্দ নেই। আরবী মাযা-র শব্দটির শাব্দিক অর্থ যিয়ারতের জায়গাও হয়। কিন্তু কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় মাযা-র শব্দটি ক্ববর যিয়ারতের জায়গা হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। বরং তা পরিদর্শন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই ক্ববরের সঠিক অর্থ মাযার হয় না।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)-এর বর্ণনায় নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ক্ববর প্রতিদিন বলে, আমি অচেনা ঘর ও আমি নির্জন ঘর। আমি মাটির ঘর ও আমি পোকামাকড়ের ঘর। (তিরমিযী, মিশকাত– ৪৫৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয়নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্ত ঘোষণা অনুসারে ক্ববর অচেনা-অজানা ঘর। এরই বিপরীত পাকা মাযার যা বহু চেনাজানা ঘর। হাদীস অনুযায়ী ক্ববর জনমানবশূন্য বিরান ঘর। এরই উল্টো পাকা মাযার যা মাযার ভক্তদের ভিড়ের বাজার। ক্ববর মাটির ঘর। কিন্তু পাকা মাযার সিমেন্টের ঘর ও চোখ ধাঁধানো মার্বেল পাথরের আকর। ক্ববর পোকামাকড়ের ভয়ংকর ঘর। কিন্তু মাযার দুনইয়াবী মজা পাওয়ার চিত্তাকর্ষক আধার। তাই মানুষের মনে পরকালের ভয় সৃষ্টিকারী মাটির ক্ববর এবং দুনইয়াদারী চটকদারীর আকর পাকা মাযার একই জিনিস হতে পারে কি? আল্লাহ আমাদেরকে হাক্ব এবং না হাক্ব বুঝবার সুমতি দিন– আমীন!

ক্ববর ও তা যিয়ারতের-খবর

বুরাইদাহ্‌র বর্ণনায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি তোমাদেরকে ক্ববর যিয়ারত করতে মানা করেছিলাম। এখন তোমরা তা যিয়ারত কর। (মুসলিম, মিশকাত– ১৫৪ পৃষ্ঠা)

ইবনু মাসউদের বর্ণনায় এতটা বাড়তি আছে যে, তিনি সল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেন, এটা দুনইয়ার ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ করে এবং পরকালকে মনে করিয়ে দেয়। (ইবনু মাজাহ্– ১১৪ পৃষ্ঠা; মিশকাত– ১৫৪ পৃষ্ঠা)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ)'র বর্ণনায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ববর অধিক যিয়ারতকারিণী নারীদেরকে অভিসম্পাৎ ও লা'নাত করেছেন।
(আহমাদ, তিরমিযী– ১ম খণ্ড ১১৫ পৃষ্ঠা, ইবনু মাজাহ্– ১১৪ পৃষ্ঠা; মিশকাত– ১৫৪ পৃষ্ঠা)

বিরান ক্ববর যিয়ারত করলে দুনইয়ার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ভাব অবশ্যই সৃষ্টি হয়। কিন্তু চাকচিক্যময় মাযার পরিদর্শন করলে দুনইয়ার মোহ একটুও কমবে কি? ক্ববরের যিয়ারত প্রায়ই একা একা করা হয়। ফলে তা আখিরাতকে মনে করিয়ে দেয়। তেমনি ক্ববরের যিয়ারতে ভিড়ের দরকার হয় না। কিন্তু মাযারের উরস জনকোলাহল ছাড়া হয় না এবং তা মানায়ও না।

দুনইয়াদারী কারবারের মাধ্যমে বেশীরভাগ মাযারগুলোতে নারীদেরই ভিড় বেশী হয়। ঐ চাকচিক্যময় মাযারগুলো বিরান ক্ববরের পর্যায়ে পড়ে না। তথাপি তর্কের খাতিরে ঐগুলোকে যদি ক্ববর মনে করা হয় এবং ওখানে নারীদের উপস্থিতিকে যদি ক্ববর যিয়ারত ভাবা হয় তাহলে নারীদের ক্ববর যিয়ারত সম্পর্কে একটু পর্যালোচনা করা যাক।

উপরে বর্ণনা করা হয়েছে যে, অধিক ক্ববর যিয়ারতকারিণী নারীদের উপর আল্লাহর রসূল লা'নাত্ করেছেন। তাহলে নারীদের ক্ববর যিয়ারত করা পারতপক্ষে বাঞ্ছনীয় হয় কি? উপরে বর্ণিত একটি হাদীসে ক্ববর যিয়ারত করা মানা করার পর আবার তা করার হুকুম দেয়া হয়েছে। ঐ হুকুমের মধ্যে পুরুষ ও নারী উভয়ই শামিল কি না এ ব্যাপারে 'আলিমদের মধ্যে মতভেদ আছে।

কিছু 'আলিমের মতে মেয়েদের জন্য ক্ববর যিয়ারত করা আপত্তিকর কাজ। অন্যদের মতে তা শর্তসাপেক্ষে বৈধ। শর্ত এই যে, যিয়ারতকারিণীরা যেন রং ঢং করে বের না হয এবং চিল্লে চিল্লে কেঁদে উতলা না হয় এবং পর-পুরুষদের সাথে মিলেমিশে একাকার না হয়ে যায়।(মিরআতুল মাফাতীহ্– ২য় খণ্ড ৫৩৫ পৃঃ, লাখনাও ছাপা)

'আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-এর আপন ভাই আব্দুর রহমান (রাযিঃ) হুবশী নামক এক জায়গায় মৃত্যুবরণ করেন। তারপর তাঁর লাশ মাক্কায় এনে দাফন করা হয়। অতঃপর 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) তাঁর ক্ববর যিয়ারত করতে এসে তাঁর রূহকে লক্ষ্য করে বলেন, আমি যদি তোমার মরণস্থলে হাযির থাকতাম তাহলে তোমার এই ক্ববর যিয়ারত করতে আমি আসতাম না। (তিরমিযী– ১ম খণ্ড ১২৫ পৃষ্ঠা)

তাই নারীদের ক্ববর যিয়ারত ঢালাওভাবে কাম্য নয়। বরং উপরে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে তা কাম্য।

পাকা ক্ববর ও উরসের আসর

কোন ক্ববর যদি বিরান পড়ে থাকে তাহলে সেখানে উরসের আসর জমতে পারে না। তাই শির্ক ও বিদ'আতের ঘোর দুশমন মহানাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ক্ববরকেই পাকা না করার জন্যই ক্ববরে সিমেন্ট লাগাতে এবং তার উপরে বসতে ও তার উপরে ঘর বানাতে মানা করেছেন।

(মুসলিম– ১ম খণ্ড ৩১২ পৃষ্ঠা; মিশকাত– ১৪৮ পৃষ্ঠা)

জাবির (রাযিঃ)-এর অন্য বর্ণনায় নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ববরগুলোতে সিমেন্ট লাগাতে ও তাতে নাম লিখতে এবং তাতে ঘর বানাতে ও তা মাড়াতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী– ১ম খণ্ড ১২৫ পৃষ্ঠা; আবূ দাঊদ– ২য় খণ্ড ১০৪ পৃষ্ঠা; ইবনু মাজাহ্– ১ম খণ্ড ১১৪ পৃষ্ঠা; নাসাঈ– ১ম খণ্ড ২২১ পৃষ্ঠা; ইবনু হিব্বান, হাকিম, বাইহাকী, তালখীসুল হাবীব– ১৬৫ পৃষ্ঠা)

কোন বিরান ক্ববরে যখন ঘর বানানো হয় এবং তাতে সিমেন্ট লাগিয়ে ও নামধাম লিখে দেয়া হয় তখন তা আর ক্ববর থাকে কি? তদুপরি সেখানে যখন কেউ বসে দুনইয়াবী দোকানদারী শুরু করে দেয় তখন সেটা পরিদর্শনের ক্ষেত্র তথা মাযারে পরিণত হয়ে যায় না কি? পরিশেষে ঐ মাযারে যদি বছরের কোন একটি বিশেষ দিনে জনগণকে আকৃষ্ট করার জন্য একটি আসর বসানো যায় তাহলে সেটাই উরস বা আনন্দের বাসরে পরিণত হয় না কি? তাই কোন ব্যক্তি আমাদের কাছে যতই ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হোন না কেন, তার বিরান ক্ববরটিকে পাকা করে মাযারে পরিণত করলে ঐ পাকা করানেওয়ালা ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপরোক্ত ফরমানগুলোকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছেন না কি? আল্লাহ আমাদেরকে ও তাদেরকে তাঁর ফরমান মোতাবেক কাজ করার সুমতি দিন– আমীন!

ক্ববর পাকা করা ও হানাফী ফাতাওয়া

উক্ত হাদীসগুলোর ভিত্তিতে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন ঃ 'ক্ববর পাকা করা মানা' (জামিউস সগীর– ২১ পৃষ্ঠা)। একদা ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল যে, 'ক্ববরকে পাকা করা অপসন্দনীয় কাজ কি?' তিনি বলল, 'হ্যাঁ।' (কিতাবুল আস্‌ল– ১ম খণ্ড ৪২২ পৃষ্ঠা)

বিখ্যাত হানাফী ফকীহ্ ইমাম সারাখ্‌সী (রহঃ) বলেন, ক্ববরগুলোকে পাকা করো না। কারণ, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এর নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত আছে। (আলমাব্‌সূত ২য় খণ্ড ২য় খণ্ড ৬২ পৃষ্ঠা)

'আল্লামা কাযীখান বলেন, ক্বর পাকা করা হবে না এবং ওর উপরে গম্বুজও বানানো যাবে না। কারণ ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) থেকে ওর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। (ফাতাওয়া কাযীখান– ১ম খণ্ড ১৯৪ পৃষ্ঠা)

বিখ্যাত হানাফী ফিকহ গ্রন্থ হিদায়াতে আছে, ক্বরে ইঁট ও কাঠ লাগানোও মাক্রূহ তথা আপত্তিকর কাজ। কারণ, এ দুটি জিনিস ঘরকে মযবুত করার জন্য ব্যবহার করা হয়। অথচ ক্বর হচ্ছে বিরান ও অনাবাদী থাকার জায়গা।
(হিদায়াহ্– ১ম খণ্ড ১৬২ পৃষ্ঠা)

'আল্লামা কাশনী হানাফী (রহঃ) বলেন, ক্বর পাকা করা মাকরূহ। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেছেন, ক্বরের উপরে গম্বুজ প্রভৃতি তৈরী করা মাকরূহ। এতে ধন-মাল নষ্ট হয়। তবে ক্বরে পানি ছিটানোয় আপত্তি নেই। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসূফ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, পানি ছিটানোও আপত্তিকর। কারণ এর দ্বারা ক্বর আরো শক্ত হয়। (বাদায়ি সানায়ি– ১ম খণ্ড ৩২০ পৃষ্ঠা)

হানাফী ফিক্হ গ্রন্থ কানযুদ দাকায়িকে আছে, মাটি ফেলা হবে এবং ক্বরটি উটের কুঁজের মত করা যাবে। কিন্তু চার কোণা করা যাবে না এবং সিমেন্ট দিয়ে তা পাকা করা যাবে না।
(কানযুদ দাকায়িক মুজতাবায়ী দিল্লী ছাপা– ৫০ পৃষ্ঠা; ঐ মাজীদী কানপুর ছাপা– ৫৫ পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয় আবূ হানীফা 'আল্লামা ইবনু নুজাইম (রহঃ) বলেন, ক্বরে পাকা ইট ও কাঠ লাগানো মাকরূহ। কারণ এ দুটি বস্তু ঘরকে শক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। অথচ ক্বর হচ্ছে বিরান জায়গা। তাছাড়া ইটের মধ্যে আগুনের চিহ্নও আছে। তাই এটা মাকরূহ। (বাহরুর রায়িক– ১ম খণ্ড ১৪৯ পৃষ্ঠা)

হানাফী মুহাদ্দিস 'আল্লামা মোল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, ক্বরে পাকা ইট গাঁথা ও কাঠ পোঁতা মাকরূহ। কারণ এটা ঘরকে মযবূত করার বস্তু। অতএব এ দুটি বস্তু ঘরকে বিরান করার মধ্যে গণ্য হবে না। কারণ ইটকে আগুন ছুঁয়েছে এবং কাঠটা আগুন লাগাবার জন্য তৈরী করা হয়। তাছাড়া বিখ্যাত সহাবী আম্র ইবনু 'আস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তোমরা আমার ক্বরে কাঠ ও ইট রেখ না।
(শারহুন নিকায়াহ্– ১ম খণ্ড ১৩৯ পৃষ্ঠা)

হানাফী ফিকহ্ গ্রন্থ মারাকিল ফালাহ্তে আছে, ক্বর চার কোণা হবে না এবং সিমেন্ট লাগিয়ে তাকে পাকা করা হবে না। কারণ নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্বর পাকা করতে নিষেধ করেছেন। ইমাম কারখীর আলমুখতাসারে আছে, একবার রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পুত্র ইব্রহীমের ক্বরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। অতঃপর তাতে তিনি একটা পাথর দেখতে

পেলেন। পাথরটা তাতে ফেলে দিয়ে তিনি ক্ববরটা বন্ধ করে দিলেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করবে সে যেন মজবুতভাবে তা করে।

(হাশিয়া তাহতাভী আলা-মারাকিল ফালাহ্– ৩৩৫ পৃষ্ঠা; দামিশ্ক ছাপা– ১৩৮৯ হিজরী সংস্করণ)

ব্রেলভী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা 'আল্লামা আহমাদ রেযা খান ব্রেলভী বলেন, ক্ববরের উপর গম্বুজ তৈরী করা এবং ক্ববরকে পাকা করা হারাম। আমার পিতা এবং মাতার ক্ববর এক বিঘত উঁচু। তার উপরে কোন ইমারত নেই।

(ফাতাওয়া রিয্ভিয়্যাহ্, মাসিক মুহাদ্দিস, বেনারস, ডিসেম্বর– ১৯৮৫ সংখ্যা ৩৩ পৃষ্ঠা)

ইমাম শাফিঈ (রহঃ) বলেন ঃ আমি পসন্দ করি যে, ক্ববরে যেন বুনিয়াদ না গড়া হয় এবং তাতে সিমেন্ট না লাগানো হয়। আমি মুহাজির এবং আনসারদের ক্ববর সিমেন্ট করা পাকা দেখিনি। আমি এটা দেখেছি যে, মাক্কার শাসকদের কেউ ক্ববরের উপরের পাকা গাঁথনী ভেঙ্গে দিচ্ছেন। অথচ সেখানকার ফিক্হবিদগণ এটাকে দূষণীয় মনে করছেন না। (কিতাবুল উম্ম– ১ম খণ্ড ২৪৬ পৃষ্ঠা)

'আল্লামা কাযী ইবরাহীম হানাফী (রহঃ) বলেন ঃ সেই সব গম্বুজ যা ক্ববরের উপরে তৈরী করা হয়েছে তা ভেঙ্গে দেয়া ফার্য। কারণ এগুলো রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবাধ্যতা ও অমান্যতার ভিত্তিতে নির্মাণ করা হয়েছে। আর যে ইমারত নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অমান্যতায় তৈরী করা হয়েছে তা ভেঙ্গে দেয়া যেরার মাসজিদের চেয়েও বেশী যরুরী।

(মাজলিসুল আব্রার– ১২৯ পৃষ্ঠা)

'আল্লামা আবদুল হক্ব মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) বলেন, ইট বা কাঠের ঘর হোক কিংবা তাঁবু ক্ববরে লাগানো মানা। (আশি'আতুল লাম্আ-ত)

হানাফী ফিক্হ শরহে বেকায়াহতে আছে, পাকা ইট ও কাঠ ক্ববরে লাগানো মাকরূহ। (শারহুল বেকায়াহ্– ১ম খণ্ড ২১০ পৃষ্ঠা)

হানাফী ফকীহ্ 'আল্লামা ইব্রহীম হালাবী (রহঃ) বলেন, ক্ববরে ইট ও কাঠ লাগানো মাকরূহ। কারণ, এগুলো ঘরকে মযবুত করার জন্য ব্যবহার করা হয়। অথচ ক্ববর হচ্ছে বিরান ও অনাবাদ থাকবার জায়গা। তাই বিখ্যাত তাবিঈ আস্আদ ইবনু ইয়াযীদ (রহঃ) অসিয়্যত করেন যে, তাঁর ভক্তরা যেন তাঁর ক্ববরে ইট না লাগায়। আর এক তাবিঈ ইব্রহীম নাখ্ঈ (রহঃ) বলেন, তাবিঈগণ তাঁদের ক্ববরে পাকা ইট লাগাতে আপত্তি করতেন। (গুনয়্যাতুল মুস্তাম্লী ওরফে কাবীরী– ৫৫০ পৃষ্ঠা)

হানাফী মাযহাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন, ক্ববরে সিমেন্ট লাগানো এবং তা লেপা অথবা ওর নিকটে মাসজিদ তৈরী করা কিংবা ওতে ঝাণ্ডা গাড়া, নতুবা ক্ববরে কিছু লেখা এবং পাকা ইট গাঁথা কিংবা ক্ববরের ভেতরে ইট ভরে দেয়া সবই মাকরূহ তথা হারাম কাজ। (কিতাবুল আসার– ১২০ পৃষ্ঠা)

হানাফী ফিক্হ গ্রন্থ নুরুল ঈযাহ্ গ্রন্থ প্রণেতা বলেন, সৌন্দর্যের জন্য ক্বর পাকা করা হারাম এবং দাফনের পর তা মযবুত করার ব্যবস্থা নেয়া মাকরূহ। তাতে পাকা ইট ও কাঠ লাগানো আপত্তিকর। (নুরুল ঈযাহ– ১২৬ পৃষ্ঠা)

মাওলানা 'আব্দুল হাই লাখনভী (রহঃ) বলেন, ক্বর কাঁচা হওয়া উচিত। পাকা ইট এবং কাঠ ক্বরে লাগানো মাকরূহ। (ফাতাওয়া 'আব্দুল হাই উর্দু কামিল মুবাওব– ২৩০ পৃষ্ঠা)

ক্বর পাকা করা হারাম ও মাকরূহ বলে নিম্নলিখিত হানাফী ফিকহ গ্রন্থে ফাতাওয়া আছে– (ফাতহুল কাদীর ১ম খণ্ড ৪৭২ পৃষ্ঠা; দুররে মুখতার ১ম খণ্ড ১২৫ পৃষ্ঠা; রুদ্দুল মুতহার আলা দুররিল মুখতার ১ম খণ্ড ৮৩৮ ও ৮৩৯ পৃষ্ঠা; ফাতাওয়া আলমগীরী ১ম খণ্ড ৮৫ পৃষ্ঠা; ফাতাওয়া বায্যাযিয়্যাহ ৪র্থ খণ্ড ৮১ পৃষ্ঠা; ব্রেলভীয়্যাত– ২০৮ পৃষ্ঠা)

পূর্বে হানাফী ফকীহদের কোন কোন ফাতাওয়ায় উল্লিখিত হয়েছে যে, ক্বর পাকা করা মাকরূহ। ফকীহদের মতে মাকরূহ দুই প্রকার। এক. তাহ্রীমী , যা আপত্তিকর হারাম। দুই. তানযীহী, যা এমন আপত্তিকর যে, তা না করাটাই ভাল। তবে তা করলে হারাম কাজ হবে না। তাঁদের মতে ক্বর পাকা করাটা মাকরূহে তানযীহী নয়, বরং তাহ্রীমী। তাই ফাতাওয়া আলমগীরী ১ম খণ্ডে বলা হয়েছে, 'আলমাকরূহ আত্তাহরীমী ইনদাল ইমাম' অর্থাৎ– ঐ মাকরূহটা ইমাম আবূ হানীফার নিকট মাকরূহে তাহ্রীমী। উসুলে ফিক্হের গ্রন্থ মিয়াতুল মাসায়িল ফী তাহ্সীলিল ফাযায়িলে আছে যে, না-বাচকের আসলটা তাহ্রীম বা হারাম।
(ফাতাওয়া নাযীরিয়্যাহ্– ১ম খণ্ড ৭১২ পৃষ্ঠা)

বিখ্যাত হানাফী ফিকহ্ গ্রন্থ শামীতে লিখা আছে যে, "অ'লাম্ আন্নাল মাকরূহা ইযা-উত্লিকা ফী কালা-মিহিম ফালমুরা-দু মিন্হুত তাহ্রীম।" অর্থাৎ– ফকীহদের কথায় যখন সাধারণভাবে মাকরূহ কথা বলা হয় তখন তার ভাবার্থ হয় হারাম– (শামী ১ম খণ্ড ২০৭ পৃষ্ঠা, মিসরী ছাপা)। তাই ক্বর পাকা করা হানাফী ফকীহদের মতে মাকরূহে তাহ্রীমী তথা হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ।

ক্বরের উচ্চতা হবে কতটা

প্রসিদ্ধ তাবিঈ আবুল হাইয়্যাজ আসাদী (রহঃ) বলেন, একদিন আমাকে আলী (রাযিঃ) বললেন, আমি তোমাকে সেই কাজে পাঠাব না কি, যে কাজে আমাকে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠিয়েছিলেন? তা হল এই যে, তুমি কোন মূর্তিকে না মিটিয়ে ছাড়বে না এবং কোন উঁচু ক্বরকে যমীনের সমান না করে ছাড়বে না। (মুসলিম ১ম খণ্ড ৩১২ পৃষ্ঠা; আবূ দাঊদ ২য় খণ্ড ১০৩ পৃষ্ঠা; তিরমিযী ১ম খণ্ড ১১৫ পৃষ্ঠা; বায়হাকী ৪র্থ খণ্ড ৩য় পৃষ্ঠা; মুসনাদে আবূ দাঊদ তাইয়ালিসী ১ম খণ্ড ১৬৮ পৃষ্ঠা; মুসনাদে আহমাদ ১ম খণ্ড ২০৭, ১২৯, ১৪৫ পৃষ্ঠা)

'আব্দুল্লাহ ইবনু শুরাহ্বীল ইবনু হাসানাহ বলেন, আমি তৃতীয় খালীফা

'উসমান গনী (রাযিঃ)-কে দেখেছি যে, তিনি ক্বরগুলোকে সমান করার নির্দেশ দিচ্ছেন। তাঁকে একবার বলা হল যে, এটা আপনারই কন্যা উম্মু আম্‌রের ক্ববর। তবুও তিনি বললেন, ওটাকে সমান করে দাও। তাই ওটাকে সমান করে দেয়া হল। (মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবাহ্ ৩য় খণ্ড ৩৪১ পৃষ্ঠা)

উপরে বর্ণিত প্রথম হাদীসটির ব্যাখ্যায় বিখ্যাত হানাফী মুহাদ্দিস 'আল্লামা মোল্লা 'আলী ক্বারী বলেন ঃ ক্ববরের উপরে যে বিল্ডিং তৈরী করা হয়েছে সেটাকে ভেঙ্গে যমীন বরাবর করার হুকুম দেয়া হয়েছে। সেই উচ্চতাকে নয়, যেটা ক্ববরের চিহ্ন ও তার হিফাযাতের কারণ হয়ে থাকে। আল্‌আয্‌হারে লেখা আছে, 'আলিমগণ বলেন, ক্ববরকে এক বিঘত, দু-বিঘত উঁচু করা মুস্তাহাব। তথা পসন্দনীয় কাজ। তার চেয়েও উঁচু হলে সেটাকে ভেঙ্গে দেয়াই মুস্তাহাব। তবে কতটা ভাঙ্গা হবে তাতে অবশ্য মতভেদ আছে। কিছু আলিম বলেন যে, লোকদেরকে সতর্ক করা ও ডাঁট দেয়া এবং শিক্ষা দেবার জন্য শারী'আতী সীমার চেয়েও উঁচু ক্ববরগুলোকে যমীনের সমান করে দেয়া উচিত। এই মতটিই হাদীসের শব্দ 'সাও্অই্তাহু' তুমি তাকে যমীনের সমান করে দেবে– এর অধিক নিকটবর্তী।

(মিরআতুল মাফাতীহ– ২য় খণ্ড ৩৭২ পৃষ্ঠা)

বিখ্যাত সহাবী আবূ মূসা আশ্‌আরী (রাযিঃ) তাঁর মরণকালে কতিপয় অসিয়্যাত করেন। তন্মধ্যে একটি ছিল এই যে, আমার এবং আমার ক্ববরের মাঝে (কাফন ছাড়া) আর কোন আড়াল যেন না থাকে এবং আমার ক্ববরের উপরে কোন ঘর তৈরী করবে না। (মুসনাদে আহমাদ ৪র্থ খণ্ড ৩৯৭ পৃষ্ঠা এর বরাতে কাবরুঁ পর মাসাজিদ কী তা'মীর– ৯২ পৃষ্ঠা)

বিশিষ্ট তাবিঈ আম্‌র ইবনু শুরাহ্‌বীল নির্দেশ দেন যে, আমার ক্ববরকে উঁচু করো না। মুহাজিরগণ (রাযিঃ) ওটাকে মাকরূহ (হারাম) মনে করতেন।

(শেষোক্ত ৯৮ পৃষ্ঠা)

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর বিশিষ্ট ছাত্র ইমাম আবূ ইউসূফ (রহঃ) বলেন, আমরা এটাকে বৈধ মনে করি না যে, ক্ববর থেকে যত মাটি বের হবে তার চেয়ে বেশী মাটি ওতে ঢালা যাবে। তেমনি ক্ববরকে পাকা করা ও তাকে লেপা পোছা করা কিংবা ওর কাছে মাসজিদ তৈরী করা আমাদের নিকটে মাকরূহ (তথা হারাম)। (তাহযীবুল আসার– ৪৫ পৃষ্ঠা)

এক তাবিঈ সুমামাহ ইবনু শুফাই বলেন, একবার আমরা রোমকদের অধীনস্থ রোডস্ নামক দ্বীপে (সহাবী) ফাযালাহ ইবনু উবাইদের সাথে ছিলাম। অতঃপর আমাদের এক সাথী মারা যান। তিনি তাঁকে ক্ববর দেবার নির্দেশ দেন। অতঃপর তা যমীনের সমান করে দেয়া হল। তারপর তিনি (রাযিঃ) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি ক্ববরকে যমীনের সমান করে দেবার কথা। (মুসলিম ১ম খণ্ড ৩১২ পৃষ্ঠা; আবূ দাঊদ– ২য় খণ্ড ১০৩ পৃষ্ঠা)

ক্ববর পাকা ও তা ভাঙ্গার ফাত্ওয়া

আবূ মুহাম্মাদ হুযালী থেকে বর্ণিত; 'আলী (রাযিঃ) বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জানাযায় ছিলেন। অতঃপর তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে কে মাদীনায় যেতে পারে? তারপর সে তথায় কোন মূর্তি পেলে তা না ভেঙ্গে ছাড়বে না এবং কোন ক্ববর পেলে তা যমীন বরাবর না করে ছাড়বে না। আর কোন ছবি পেলে সেটাকে সে না মিটিয়ে ছাড়বে না। তখন একজন লোক বলল, আমি যাব, হে আল্লাহর রসূল! অতঃপর তিনি চলে গেলেন। কিন্তু মাদীনাবাসীদেরকে ভয় পেয়ে তিনি ফিরে এলেন। তখন 'আলী (রাযিঃ) বলল, আমি যাব, হে আল্লাহর রসূল! অতঃপর তিনি গেলেন। তারপর তিনি ফিরে এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি সেখানে ছাড়িনি এমন কোনও মূর্তি না ভেঙে এবং কোন ক্ববর যমীনের সমান না করে। আর কোন ছবি না মিটিয়ে। তারপর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলল, যে ব্যক্তি এই জিনিসগুলো পুনরায় করবে সে অমান্য করবে সেটাকে যা মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর নাযিল করা হয়েছে। (মুসনাদে আহমাদ– ১ম খণ্ড ১৪০ ও ২২৩ পৃষ্ঠা)

ইমাম শাফিঈ (মৃত্যু ২০৪ হিজরী) বলেন ঃ তাঁর যুগে ইসলামী শাসকগণ পাকা ক্ববরগুলোকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতেন। তখনকার ফিক্বহবিদ 'আলিমগণ তাতে কোনরূপ আপত্তি করতেন না। (কিতাবুল উম– ১ম খণ্ড ২৪৬ পৃষ্ঠা)

বিখ্যাত হানাফী মুহাদ্দিস 'আল্লামা আলাউদ্দীন (মৃত্যু ৭৪৫ হিজরী) বলেন, পাকা ক্ববরগুলো ভেঙ্গে অন্যান্য সাধারণ ক্ববরের মত করে দিতে হবে।
(আল-জাওহারুন নক্বী বাইহাকী– ৪র্থ খণ্ড ৩ পৃষ্ঠা)

'আল্লামা ইবনু হাজার মাক্কী শাফিঈ (মৃত্যু ৯৭৪ হিজরী) বলেন, পাকা মাযার ও তার উপরে তৈরীকৃত গম্বুজ ও মিনারগুলো ভেঙ্গে ফেলাতে তাড়াতাড়ি করা ওয়াজিব তথা অবশ্য কর্তব্য। কারণ এইরূপ পাকা মাযারগুলো মাসজিদে যিরারের চেয়েও বেশী ক্ষতিকারক। তা এই জন্য যে, ঐগুলো রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফরমান 'ক্ববর পাকা নিষেধ' এর বিরোধিতায় তৈরী করা হয়েছে।
(আয্যাওয়ারি– ১ম খণ্ড ১৫৫ পৃষ্ঠা)

'আল্লামা মোল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, গোরস্তানের পাকা মাযার ভেঙ্গে দেয়া ওয়াজিব। যদিও তা মাসজিদ-হোক না কেন।(মিরকাত ২য় খণ্ড ৩৭২ পৃষ্ঠা)

বিখ্যাত মুফাস্সিরে কুরআন 'আল্লামা সাইয়্যিদ মাহমুদ আলূসী হানাফী (মৃত্যু ১২৭০ হিজরী) বলেন, সর্বসম্মত মতে সবচেয়ে বড় হারাম কাজ ও শির্কের কারণাবলীর মধ্যে গণ্য এগুলো– ক্ববরের কাছে সলাত আদায় করা এবং তাকে ঘিরে মাসজিদ বানিয়ে নেয়া কিংবা ক্ববরের উপরে ঘর তৈরী করা। এমতাবস্থায়

অপরিহার্য কাজ হল ঐ পাকা ক্ববরকে ভেঙ্গে দেয়া। কারণ, এগুলো রসূলুল্লাহর ফরমানের বিরোধিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর ক্ববরের জন্য কিছু ওয়াক্‌ফ করা এবং মান্‌ত করাও অবৈধ। (তাফসীর রূহুল মা'আনী– ৫ম খণ্ড ২১৯ পৃষ্ঠা)

'আল্লামা হাফিয ইবনুল কায়্যিম (মৃত্যু ৭৫১ হিজরী) বলেন, পাকা ক্ববরকে ছেড়ে দেয়া বৈধ নয় এবং ওকে ভেঙ্গে দেয়া ওয়াজিব তথা অবশ্য কর্তব্য।

(যাদুল মা'আদ ফী হাদ্‌য়ি খাইরিল ইবাদ)

উপরে বর্ণিত হাদীস এবং বিভিন্ন মাযহাবের বরেণ্য 'আলিমদের ফাতাওয়ার আলোকে কোন ক্ববরকে এক বিঘতের বেশী উঁচু করলে এবং তাকে কুঁজের মত বানালে মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর যা নাযিল হয়েছে তাকে অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসকে অস্বীকার করা হয় না কি? অতএব কেউ যদি দুনইয়াবী ধান্দাতে কুরআন ও হাদীসকে জেনেশুনে অস্বীকার করে তাহলে তার ঈমান ঠিক থাকবে কি? কেউ যদি ভুল করে কিংবা কারো চক্রে পড়ে কোন বুযুর্গের বিরান ক্ববরকে মাটি দিয়ে এক বিঘতেরও বেশী উঁচু করে ফেলে কিংবা সিমেন্ট ও মার্বেল পাথর দিয়ে ওটাকে চাকচিক্যময় মাযারে পরিণত করে ফেলে তাহলে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্বোক্ত ঘোষণা অনুসারে ঐ মাযারটিকে যমীন সমান করার ব্যাপারে তিনি একটুও চিন্তা-ভাবনা করবেন না কি? বর্তমানে যেসব পাকা মাযারে শির্ক ও বিদ'আত হয় না– 'আল্লাহ না করুন' দু-চারশো বছর বাদে সেখানে যদি সাজদাহ্ দেয়ার মত শির্ক ও বিভিন্ন পাপের প্রচলন হয়ে যায় তাহলে সরল মনে ঐ পাকা মাযার তৈরীকারীগণ সেই সমস্ত শির্ক ও বিদ'আতের এবং গর্হিত পাপাচারের ভাগীদার হবে না কি? আল্লাহ তাঁদের ও আমাদের সবাইকে সুমতি দিন– আমীন!

বুযুর্গদের ভক্তির আতিশয্য মূর্তিপূজার উৎস

কোন ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র তাঁর জীবদ্দশায় যেমন সম্মান পাবার যোগ্য তেমনি তাঁর মৃত্যুর পরেও তিনি ইসলাম নির্দেশিত নিয়মে সম্মান পাবার উপযুক্ত। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে, কোন বুযুর্গ ব্যক্তি মারা যাবার পরে তাঁর ভক্তরা তাঁর সম্মান প্রদর্শনে এত বাড়াবাড়ি করে ফেলেন যে, কখনো তা শির্কের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। যেমন বিখ্যাত তাবিঈ ইকরিমা বলেন, মানব জগতের আদি পিতা আদম 'আলাইহিস সালামের পর থেকে দ্বিতীয় আদম নূহ 'আলাইহিস সালাম পর্যন্ত দশটি পীড়ি ছিল। তাঁরা সবাই ইসলামের উপরেই ছিলেন।

(তাফসীরে ত্বাবারী– ২৯ খণ্ড ৫৪ পৃষ্ঠা)

আর এক তাবিঈ উরঅহ ইবনু যুবাইর বলেন, একদা আদম 'আলাইহিস সালাম অসুখে পড়েন। তখন তাঁর কাছে তাঁর পাঁচটি ছেলে ছিলেন। তাঁরা হলেন– (১) আদ্দ; (২) সুওয়া'অ (৩) ইয়াগূস; (৪) ইয়াউক্ব; (৫) নাস্‌র। তাঁদের মধ্যে আদ্দ সবচেয়ে বড় ও নেক্কার ছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব বলেন, তাঁরা সবাই ইবাদাত গোযার লোক ছিলেন। অতঃপর তাঁদের মধ্যে একজন মারা যান। ফলে লোকেরা সবাই তাঁর জন্য খুবই দুঃখিত হয়। এমতাবস্থায় শাইত্বন তাদেরকে বলে, আমি তোমাদের জন্য ওঁর একটি মূর্তি তৈরী করে দিচ্ছি। যখন তোমরা ঐ মুর্তিটি দেখবে তখন তাঁকে স্মরণ করতে পারবে। তারা বলল, তাহলে তাই কর। ফলে সে পিতল ও সিসা দিয়ে তাঁর একটি মূর্তি তৈরী করে দিল মাসজিদের মধ্যে। তারপর অন্যজন মারা গেল। আবার শাইত্বন তাঁরও মূর্তি বানিয়ে দিল। পরিশেষে বাকি সবাই মারা গেল এবং শাইত্বনও তাঁদের সবারই মূর্তি বানিয়ে দিল। তারপর বেশ কিছুদিন গত হল। এক যুগ পর লোকেরা আল্লাহর ইবাদাত ছেড়ে দিল। এমত পরিস্থিতিতে শাইত্বন সে যুগের লোকদেরকে বলল, তোমরা কোন জিনিষেরই ইবাদাত করছ না কেন? তারা বলল, আমরা কিসের ইবাদাত করব? শাইত্বন বলল, তোমাদের উপাস্যের এবং তোমাদের বাপদাদাদের উপাস্যের। তোমরা কি তোমাদের সলাতের জায়গাতে তাদের মূর্তি দেখছ না? অতঃপর তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পূজা শুরু করল। পরিশেষে আল্লাহ নূহ 'আলাইহিস সালামকে রসূল করে পাঠালেন। তখন কিছুলোক অন্যান্যদেরকে বলল, তোমরা কখনই ছেড় না তোমাদের উপাস্যগুলোকে এবং কখনই ছেড়োনা অদ্দ ও সুওয়াকে এবং ইয়াগুস ও ইয়াউক্‌কে আর নাস্‌রকে। সেই সময় থেকেই মূর্তি পূজা শুরু হলো। (তাফসীরে কুরতুবী ১৮ খণ্ড ১৯৯ পৃষ্ঠা)

বিখ্যাত তাফসীরকার আব্দু বনু হুমাইদ আবূ মুতাহ্‌হার থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার ইমাম আবূ 'জাফর বাকিরের সামনে লোকেরা ইয়াযীদ ইবনু মুহাল্লাবের আলোচনা করল। তখন তিনি বললেন, ইনি সেই ভূমিতে নিহত হন যেখানে সর্বপ্রথম আল্লাহ ব্যতীত অন্যের পূজা হয়েছিল। তারপর তিনি অদ্দ এর আলোচনা করে বললেন, অদ্দ একজন মুসলমান এবং তাঁর জাতির কাছে প্রিয়ব্যক্তি ছিলেন। অতঃপর তিনি যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন লোকেরা তাঁর ক্ববরের চারপাশে জড় হয় এবং তাঁর জন্য শোক মানায়। অতঃপর ইবলীস যখন তাদের শোকপ্রকাশ দেখল তখন সে মানুষের রূপ ধরে এসে তাদেরকে বলল, আমি এঁর ব্যাপারে তোমাদের মাতম করা দেখছি। তোমাদের কী অভিমত? আমি যদি ওঁর একটা মূর্তি তৈরী করে দিই? অতঃপর সেটা তোমাদের সভাতে থাকবে। ফলে তোমরা তাকে স্মরণ করতে পারবে? তারা বলল, হ্যাঁ। ফলে শাইত্বন তাদের জন্য

ওর মত একটা মূর্তি তৈরী করে দিল। অতঃপর তারাও সেটাকে তাদের সভাতে রাখল এবং তাঁকে স্মরণ করতে লাগল।

অতঃপর শাইত্বন যখন তাদেরকে ওঁর স্মরণ করাটা লক্ষ্য করল তখন সে তাদেরকে বলল, আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির ঘরে একটি করে মূর্তি ওঁর মত বানিয়ে দেব কী যা প্রত্যেকের ঘরে থাকবে? ফলে সে তাঁকে স্মরণ করতে পারবে? তারা বলল, হ্যাঁ। তাই শাইত্বন প্রত্যেক বাড়িওয়ালার জন্য একটি করে মূর্তি ওঁর মত বানিয়ে দিল। অতঃপর তারা এগিয়ে এল এবং তাঁকে স্মরণ করতে লাগল। তারপর শাইত্বন তাদের ছেলে-মেয়েদেরকে পেল। তারাও তাদের বাপ-দাদাদের মত করতে থাকল। এভাবে কয়েক পীড়ি চলল। তারপর তাঁকে স্মরণ করার ব্যাপারটা মুছে গেল। পরিশেষে লোকেরা তাঁকে উপাস্য বানিয়ে নিল– যাঁকে তারা পূজা করতে থাকল। আল্লাহকে বাদ দিয়ে সর্বপ্রথম যার পূজা ভূ-পৃষ্ঠে করা হয় তা হল 'অদ্দ' ঠাকুরের পূজা। যার নাম তারা 'অদ্দ' রেখেছে।

(তাফসীর দুররে মানসূর– ৬ষ্ঠ খণ্ড ৪২৮ পৃষ্ঠা)

উক্ত বর্ণনা দুটি পরিষ্কার প্রমাণ করে যে, বুযুর্গদের চরম ভক্তির আতিশয্যই মূর্তিপূজার উৎস। প্রাচীন যুগের লোকেরা তাদের মৃত বুযুর্গদের তাযীম ও সম্মান অভিনব উপায়ে করত। প্রথমে তারা তাদের ভক্তির পাত্রের মূর্তি বানাত এবং তদ্দ্বারা বারকাত হাসিল করত। পরিশেষে ঐ ভক্তিটা শাইত্বনের প্ররোচনায় পূজায় পরিণত হয়। তারাও পরবর্তীকালে শাইত্বনের ধোঁকায় বুযুর্গদের শ্রদ্ধা ও ভক্তিটা তাদের বিরান কৃবরে পাকা মাযার তৈরী করার এবং সেখানে উরসের আসর বসানোর রূপ নেয়।

কৃবর ও মেলার আসর

বিখ্যাত সহাবী আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ)-এর বর্ণনায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কৃবর বানিও না এবং আমার কৃবরকে ঈদ (উৎসবের আসর) বানিও না। আর তোমরা আমার উপরে দরূদ পড়। কারণ তোমাদের দরূদগুলো আমার কাছে পৌঁছে যায় তোমরা যেখানেই থাক না কেন।

(আবূ দাঊদ– ১ম খণ্ড ২৭৯ পৃষ্ঠা; কিতাবুল মানাসিক, নাসাঈ, মিশকাত– ৮৬ পৃষ্ঠা)

উক্ত হাদীসের শব্দে একটি শব্দ 'ঈদ' আছে। যার ভাবার্থ বর্ণনায় বিখ্যাত বিদ্বান 'আল্লামা মানাভী বলেন, "মা'না-হু আন্নাহ্যু আনিল ইজতিমা-য়ি লি-যিয়া-রতিহী কা ইজ্তিমা-য়িহিম লিলয়ীদ।" ঐ নিষেধের অর্থ তাঁর যিয়ারতের জন্য ভিড় না করা যেমন তারা ঈদের জন্য ভিড় করে। (আওনুল মা'বুদ– ২য় খণ্ড ১৭১ পৃষ্ঠা)

তাই হাদীসের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তোমরা আমার ক্ববর যিয়ারতের জন্য কোনরূপ সমাবেশ করো না, যেমন তোমরা ঈদের জন্য জামায়েত করে থাক।

উক্ত হাদীসটির ভিত্তিতে আল্লামা মানা-ভী আরো বলেন, হাদীস থেকে এই মাসালা বের হয় যে, বছরের কোন এক বিশেষ মাসের বিশেষ দিনে কোন অলীর ক্ববরে জনগণের সমাবেশ করা এবং তথায় তাদের খাওয়া ও পান করা এবং কখনো সেথায় নাচগান করা শারী'আত বিরোধী কাজ। এমতাবস্থায় শারী'আতের অভিভাবক প্রত্যেক শাসকের উচিত জনগণকে তা থেকে বিরত রাখা এবং তাদের বিরুদ্ধাচরণ করা ও তা বাতিল প্রমাণ করা।

(আওনুল মা'বূদ, শারহু সুনানি আবী দাঊদ– ২য় খণ্ড ১৭১ পৃষ্ঠা)

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বিখ্যাত হানাফী মুহাদ্দিস 'আল্লামা মোল্লা 'আলী ক্বারী বলেন, ঈদের জন্য তোমাদের জামা'আত যেমন হয় সেরূপ জামা'আত তোমরা ক্ববর যিয়ারাতের জন্য করো না। (মিরকাত– ২য় খণ্ড ৬ পৃষ্ঠা)

'আল্লামা তীবী বলেন, হাদীসটির ভাবার্থ অধিক যিয়ারাত করাও হতে পারে। তাই তোমরা আমার ক্ববরটাকে সেই ঈদের মত বানিয়ে দিও না, যা বছরে কেবলমাত্র একবারই আসে। (মিরকাত– ২য় খণ্ড ৬ পৃষ্ঠা)

হাদীসটির ব্যাখ্যায় 'আল্লামা শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্তি– তোমরা আমার ক্ববরকে ঈদ বানায়োনা-এর ভাবার্থে আমি বলি যে, এতে বিকৃতি দূর করার ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন ইয়াহূদী ও খৃষ্টানরা তাদের নাবীদের ক্ববরগুলোকে হাজ্ব ও বার্ষিক সমাবেশ বানিয়ে দিয়েছে। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্– ২য় খন্ড ৭৭ পৃষ্ঠা, মিসরী ছাপা)

শাহ্ সাহেব আরো বলেন, যে ব্যক্তি আজমীরে খাজা (ময়নুদ্দীন) চিশতীর কবরে কিংবা সা-লা-র মাসউদ গাযীর ক্ববরে অথবা তাঁদের মত আরো কারো মাযারে এজন্য গেল যে, সেখানে সে দু'আ করবে। ফলে সে এমন পাপ করলো যা হত্যা করা ও ব্যভিচার করার চেয়েও জঘন্যতম পাপ।

(তাফ্হীমাতে ইলা-হিয়্যাহ্– ২য় খণ্ড ৪৯ পৃষ্ঠা, রাহি সুন্নাত– ২৬১ পৃষ্ঠা)

উক্ত হাদীস এবং ওর ব্যাখ্যা সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো প্রমাণ করে যে, যে কোন ক্ববরে ও মাযারে বছরের একটি দিন নির্দিষ্ট করে জনগণের সমাবেশের ব্যবস্থা করা অর্থাৎ উরস নাম দিয়ে সেখানে ঈদ তথা মেলার আসর বসানো ইসলামী শারী'আত বিরোধী কাজ। বিখ্যাত হানাফী মুহাদ্দিস আল্লামা 'আলী মুত্তাকী বলেন, মৃত ব্যক্তির জন্য বিশেষ জমায়েত করা নিন্দিত বিদ'আত কাজ।

(রিসালাহ্ রদ্দে বিদ'আত, রাহে সুন্নাত– ২৬৫ পৃষ্ঠা)

'আল্লামা শাহ্ 'আব্দুল 'আযীয (রহঃ) বলেন, একটি দিন নির্দিষ্ট করে বিভিন্ন ক্ববরে জমায়েত হওয়া এবং গান-বাজনা করা ও সজদাহ্ করা হারাম এবং নিষিদ্ধ কাজ। বরং কিছু কাজ কাফিরী কাজ। (ফাতাওয়াই আযীযী– ১ম খণ্ড ৪৬ পৃষ্ঠা)

'আল্লামা সানাউল্লাহ পানীপথী হানাফী (রহঃ) বলেন ঃ মূর্খলোকেরা অলী ও শহীদদের মাযারে যেসব কাজ করে সেসব কাজ অবৈধ। তা হলো মাযারে সজদাহ্ করা ও তার চারপাশে প্রদক্ষিণ করা এবং বাতি জ্বালানো ও তার কাছে মাসজিদ তৈরী করা এবং একটি বছরের পর ঈদের মত সেখানে জমায়েত হওয়া ও তার নামে উরস দেয়া। (তাফসীরে মাযহারী– ২য় খণ্ড ৬৫ পৃষ্ঠা)

'আল্লামা ইসহাক্ব মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) বলেন, উরসের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করা বৈধ নয়। (মাসায়িলে আরবায়ীন– ৩৮ পৃষ্ঠা, রাহে সুন্নাত– ২৬৪-২৬৫ পৃষ্ঠা)

মাওলানা রশীদ আহমাদ গাংগোহী হানাফী (রহঃ) বলেন, বুযুর্গদের ক্ববর যিয়ারত করার জন্য সফর করাটা মতভেদী ব্যাপার। কিছু 'আলিম বৈধ বলেন এবং কিছু 'আলিম তা মানা করেন। কিন্তু উরসের দিন যিয়ারত করতে যাওয়া হারাম।
(ফাতাওয়াহ রশীদিয়্যাহ্– ২ য়খণ্ড ২৯ পৃষ্ঠা; রাহে সুন্নাত ২৬৬ পৃষ্ঠা)

এরূপ উরসে সামিল হয়ে মূর্খ ও অজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিভিন্ন মাযারে সজদাহ্ দেয়া ও মান্নতের নামে জন্তু যবেহ্ করা প্রভৃতি শির্কী কাজ করে ফেলে। সেজন্য ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের মত মাযারভক্ত ব্যক্তিরা মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ববরে যাতে এরূপ শির্কী কাজ না করেফেলে তার জন্য শেষ নাবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে দু'আ করে বলেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার ক্ববরটাকে ঠাকুর বানিও না যার পূজা করা হয়। আল্লাহর ক্রোধ সেই সম্প্রদায়ের ওপরে কঠোর হয়েছে যারা তাদের নাবীদের ক্ববরগুলোকে সজদাহ্র জায়গা বানিয়ে নিয়েছে। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক; মিশকাত– ৭২ পৃষ্ঠা)

অতএব কোন ক্ববরকে কেন্দ্র করে উরসের নামে বার্ষিকী সমাবেশের মাধ্যমে তথায় মেলার আসর বসানো এবং ভবিষ্যতে সেথায় বিভিন্ন শির্কী কাজ করার সুযোগ দানকারী মাযারওয়ালা ভায়েরা ঠাণ্ডা মাথায় একটুও চিন্তাভাবনা করবে না কি?

পাকা ক্ববর ও চাদর চড়ানোর বহর

প্রায়ই দেখা যায় যে, কিছু অলী ও দরবেশের ক্ববরে প্রতি বছরে চাদর চড়ানো হয়। এখন দেখা যাক যে, এ ব্যাপারে হাদীসে রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হানাফী ফাতাওয়া কী বলে? নাবীজির প্রিয়তম স্ত্রী 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন, একবার আমি একটি কাপড় নিলাম। তারপর সেটাকে আমি দরজার পর্দা

বানিয়ে দিলাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (এক যুদ্ধ থেকে) ফিরে এলেন তখন তিনি ঐ পর্দাটিকে টেনে ছিঁড়ে ফেললেন এবং বলল– "ইন্নাল্লা-হা লাম্ ইয়া'মুর্না আন্ নালবাসাল হিজ-রতা অত্ত্বীন।" আল্লাহ আমাদেরকে পাথরে ও মাটিতে লিবাস পরানোর নির্দেশ নিশ্চয়ই দেননি। (মুসলিম)

কাঁচা ক্ববর মাটির হয় এবং পাকা মাযার ইঁট ও পাথরের হয়। তাই উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে যে কোন ক্ববরে চাদর চড়ানো আল্লাহর নির্দেশ বিরোধী কাজ হয় না কি? আল্লামা শামী হানাফী বলেন, "তুক্রহুস্ সুতূর 'আলাল ক্ববূর" অর্থাৎ ক্ববরগুলোতে চাদর চড়ানো মাক্রূহ কাজ।(রদ্দুল মুহ্তা-র আল-দুররি মুখতার- ৬৬১ পৃ)

চাদর দিয়ে ক্ববরকে ঢাকা সিদ্ধ নয়। (ফাতাওয়া মাত্বা-লিবুল মু'মিনীন)

বাতি জ্বালানো ও চাদর চড়ানো হারাম কাজ।(ফাতাওয়া শাহ রফীউদ্দিন– ১৪ পৃঃ)

অতএব উক্ত হাদীসে রসূল এবং হানাফী সমাজের বরেণ্য ফকীহ 'আল্লামা শামী (রহঃ)-এর ফাতাওয়ার আলোকে ক্ববরে চাদর চড়ানো ব্যক্তি টাকা পয়সা অপচয়কারী ও হারাম কাজের কাজী ভাইদের সুমতি হবে কি? আল্লাহ তাঁদেরকে বুঝবার তাওফীক দিন– আমীন!

পাকা মাযার ও আলোকসজ্জার ব্যবহার

সমস্ত পাকা মাযারেই দেখা যায় যে, তাতে বাতি জ্বালিয়ে তা ঝলমলে করে তোলা হয়। তাই ইবনু 'আব্বাসের বর্ণনায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নাত (অভিসম্পাত) দিয়েছেন ক্ববর যিয়ারতকারিণী নারীদের এবং ওতে মাসজিদ তৈরীকারীদের আর বাতি জ্বালানো ব্যক্তিদের। (আবূ দাঊদ– ১ম খণ্ড ১০৫ পৃষ্ঠা; নাসাঈ– ১ম খণ্ড ২২২ পৃষ্ঠা; আবূ দাঊদ তায়ালিসী– ৩৫৭ পৃষ্ঠা; তিরমিযী; মিশকাত– ৭১ পৃষ্ঠা)

বিখ্যাত সহাবী আম্র ইবুন 'আস (মৃত্যু ৪৩ হিজরী) তাঁর অন্তিম বাণীতে বলেন, আমি যখন মরে যাব তখন আমার সাথে ইনিয়ে বিনিয়ে ক্রন্দনরত নারী থাকবেনা এবং আগুনও নয়। (মুসলিম– ১ম খণ্ড ৭৬ পৃষ্ঠা)

প্রসিদ্ধ মহিলা সহাবী আসমা বিনতু আবূ বাক্র (মৃত্যু ৭৩ হিজরী) তাঁর ওয়াসিয়্যাতে বলেন, তোমরা আগুন নিয়ে আমার জানাযার পিছনে যেও না। (মুওয়াত্তা ইমাম মালিক– ৭৮ পৃষ্ঠা)

হানাফী ফিকহে বলা হয়েছে– "ওয়া য়ীক্বাদুন না-রি 'আলাল কুবূরি ফামিন রুসুমিল জাহিলিয়্যাহ" অর্থাৎ ক্ববরগুলোতে আগুন জ্বালানো ইসলামের আগের যুগের কাফিরদের প্রথা। (ফাতাওয়া আলমগীরী– ১ম খণ্ড ৮৮৬ পৃষ্ঠা)

'আল্লামা কাযী সানাউল্লাহ পানীপথী হানাফী (মৃত্যু ১২২৫ হিজরী) বলেন, অলীদের ক্ববরগুলোতে উঁচু উঁচু বিল্ডিং তৈরী করা এবং বাতি জ্বালানো হারাম কাজ।
(মালাবুদ্দা মিনহু– ৯৫ পৃষ্ঠা)

রাতের প্রথম দিকে ক্ববরগুলোতে বাতি জ্বালানো বিদ'আত।
(আইনুল হিদায়াহ্– ৪র্থ খণ্ড ২৮৯ পৃষ্ঠা; বাবুল কারাহাত)

কোন লাশকে রাতে দাফন করতে হলে গোরস্থানে বাতি জ্বালানো যাবে। কিন্তু উরসের নাম করে কিংবা অন্য বাহানা করে বিভিন্ন মাযারে আলোকসজ্জার বাহার করা পূর্বোক্ত ফাতাওয়া অনুযায়ী ইসলামী শরী'আত বিরোধী কাজ। যা অগ্নিপূজকদের অনুকরণ হয়। তাই 'আল্লামা শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) বলেন, ইসলামী 'আলিমগণ বলেছেন যে, ক্ববরের জন্য বাতি ও তেল এবং মোমবাতি প্রভৃতি মান্নত করা অবৈধ ও হারাম। কারণ, এটা পাপের মান্নত। যা পূরণ করা বৈধ নয়। বরং এরূপ মান্নতগুলোতে ওয়াদাভঙ্গের কাফ্ফারার মত কাফ্ফারা বা শারী'আতী জরিমানা দেয়া অপরিহার্য। আর ক্ববরের জন্য (বাতি) তেল, জমি, বাগান ও সম্পত্তি ইত্যাদি ওয়াক্ফ করা বৈধ নয়। কারণ এই অক্ফ সহীহ্ ও সঠিক নয়। আর তা জিইয়ে রাখা ও বহাল রাখা হালাল ও সিদ্ধ নয়। মাজালিসুল আবরার গ্রন্থপ্রণেতা উক্ত কথাগুলো উল্লেখ করেছেন।
(বালাগুল মুবীন, উর্দূ তর্জমা– ৮২ পৃষ্ঠা)

'আল্লামা মোল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, ক্ববরগুলোতে বাতি জ্বালানো নিষেধের কারণ এই যে, এটা মাল নষ্টের কারণ হয় এবং এটা জাহান্নামের চিহ্নের মধ্যে একটি। আর এর দ্বারা ক্ববরের সম্মান হয়। (মিরকাত শরহে মিশকাত)

কাযী ইব্রহীম হানাফী বলেন, ক্ববরগুলোতে চাদর চড়ানো, ওতে দারোয়ান মোতায়েন করা, ওতে চুমা দেয়া এবং ওর কাছে রুযী ও সন্তান ইত্যাদি চাওয়া কাজগুলো ইসলামী শরী'আতে বৈধ নয়। (মাজালিসুল আবরার– ১১৮ পৃষ্ঠা)

মাযার ও মান্নতের ব্যাপার

প্রায়ই দেখা যায় যে, মাযারভক্ত জনগণ বিভিন্ন মাযারগুলোতে মোরগ ও মুর্গী, বকরী ও খাসী প্রভৃতি জন্তু মান্নত করে এবং ওগুলো সেখানে যবেহ করে ও ফকীরদের মধ্যে তা বিলি করে। তাই আমাদের জানা দরকার যে, ইসলামে মান্নতের গুরুত্ব কী এবং মাযারে তা যবেহ করার ইসলামী বিধান কী?

বিখ্যাত সহাবী আবূ হুরাইরাহ্ ও ইবনু 'উমার (রাযিঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা মান্নত করো না। কারণ মান্নত

কোন জিনিসকেই ভাগ্য থেকে বেপরোয়া করতে পারে না। এমতাবস্থায় ওর (মান্নত) দ্বারা কৃপণ ব্যক্তি থেকে কেবলমাত্র কিছু মাল বের করে নেয়া হয়।
(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত– ২৯৭ পৃষ্ঠা)

তাই পারতপক্ষে মান্নত করা উচিতই নয়। তবুও কেউ যদি মান্নত করে ফেলে তাহলে তার জন্য 'আয়িশাহ্র বর্ণনায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য মান্নত করবে সে যেন তাঁর (আল্লাহর) আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি তাঁর অবাধ্য হবার মান্নত করে সে যেন তাঁর অবাধ্যতা না করে। (বুখারী, মিশকাত– ২৯৭ পৃষ্ঠা)

আল-কুরআনের সূরা হাজ্জের ২৯ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وليوفوا نذورهم *

"অল-ইউ্ফু নুযুরাহুম' অর্থাৎ তাদের উচিত তাদের মান্নত পূরণ করা। 'হানাফী ফিক্হে' আছে– মান্নত করা আল্লাহর ইবাদাত। (দুররে মুখতার– ২য় খণ্ড ১৩৯ পৃষ্ঠা)

তাই আল্লাহ ব্যতীত কোন পীরের খানকায় ও মৃত অলীর মাযারে এবং কোন দরবেশের দরগায় কোন কিছু মান্নত করা উক্ত ফিক্হে হানাফীর ফাতওয়া অনুসারে শির্ক হবে। বিভিন্ন মাযারে হালওয়া ও বাতাশা, বাতি ও চাদর প্রভৃতি চড়ানোর মান্নত করা শির্কের মধ্যে গণ্য হবে। হানাফী ফিক্হ দুররে মুখতারে আছে, তুমি জেনে রাখ যে, অধিকাংশ জনগণের পক্ষ থেকে মৃত ব্যক্তিদের জন্য যে মান্নত করা হয় এবং মাননীয় অলীদের ক্ববরে যেসব টাকা-পয়সা এবং মোমবাতি ও তেল প্রভৃতি নেওয়া হয়ে থাকে তাদের নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে সে সব কাজ সবারই মতে বাতিল ও হারাম। (দুররে মুখতার– ১ম খণ্ড ১৫৫ পৃষ্ঠা)

'তাঁদের নৈকট্য লাভের জন্য' শব্দগুলোর ব্যাখ্যায় 'আল্লামা শামী হানাফী বলেন, অলীদের নৈকট্য লাভ বলতে একথা বলা যে, হে আমাদের অমুক নেতা! আমার গায়েবী জিনিসটা যদি ফেরত পাওয়া যায় কিংবা আমার রোগ যদি সুস্থ হয়ে যায়, অথবা আমার প্রয়োজনটা যদি মিটে যায় তাহলে আপনার জন্য এত সোনা, চাঁদি কিংবা খাদ্যদ্রব্যাদি অথবা তেল ও বাতি প্রভৃতি থাকল।
(রুদ্দে মুহতার– ২য় খণ্ড ১৭৫ পৃষ্ঠা)

আর এক হানাফী 'আলিম বলেন, যারা এ কথা বলে যে, আমার প্রয়োজনটা যদি মিটে যায় তাহলে আমি অমুক অলীর উদ্দেশ্যে কিংবা অমুক অলীর নামে এতটা খাদ্য অথবা এতটা টাকা-পয়সা খরচ করব। এরূপ মান্নত করা সবারই মতে বাতিল কাজ এবং ঐ খাদ্য খাওয়াটাও হারাম।
(মযাহিরে হাক্ব– ৩য় খণ্ড ২৩৩ পৃষ্ঠা; নায্র কা বায়ান)

অবৈধ মান্নত জাহান্নামের লা'নাত

বিশিষ্ট সহাবী সালমান (রাযিঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি একটি মাছির ব্যাপারে জান্নাতে প্রবেশ করে এবং আর এক ব্যক্তি একটি মাছির ব্যাপারে জাহান্নামে প্রবেশ করে। সহাবারা বলল, তা কীভাবে? রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের আগে যারা ছিল তাদের মধ্যে দুজন লোক এমন কিছু লোকদের পাশ দিয়ে গিয়েছিল যাদের কাছে একটি ঠাকুর ছিল। তাদের পাশ দিয়ে যে কেউ অতিক্রম করছিল সেই-ই তাদের ঠাকুরের জন্য মান্নত পেশ করছিল। এতএব তারা একজন লোককে বলল, আপনি কোন জিনিস (এই ঠাকুরের নামে) মান্নত করুন। লোকটি বলল, আমার কাছে কোন জিনিস নেই। তারা বলল, তুমি একটি মাছি হলেও মান্নত কর। ফলে একটি মাছি কুরবানী দিল এবং সেখান থেকে চলে গেল। অতঃপর সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। এবার তারা অন্য লোকটিকে বলল, আপনিও কোন জিনিস কুরবানী দিন। সে বলল, আমি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো জন্য মান্নত করিনা। তাই তারা তাকে খুন করে ফেলল। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করল। (হিলয়্যাতুল আউলিয়া– ১ম খণ্ড ২০৩ পৃষ্ঠা)

উক্ত হাদীসটি প্রমাণ করে যে, মাছির মত একটি তুচ্ছ জিনিসও আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য মান্নত করা শির্ক। যা জাহান্নমে যাবার কারণ হয়েছিল। সেহেতু কোন মাযারে হালুয়া ও বাতাশা এবং মোমবাতি, আগরবাতি, চাদর, ফুল ও প্রভৃতি চড়ানো শির্ক হবে না কি? আল্লাহ ঐরূপ কাজের কাজীদেরকে সুমতি দিন– আমীন!

মাযার ও মান্নতের জানোয়ার

বিখ্যাত সহাবী আনাস (রাযিঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইসলামে 'আক্‌র' নেই। আক্‌র এর ব্যাখ্যায় 'আল্লামা আব্দুর রায্‌যাক বলেন, কাফিররা ক্ববরের কাছে গরু কিংবা বকরী যবেহ্ করত সেটাই আক্‌র। (আবূ দাউদ– ২য় খণ্ড ১০৩ পৃষ্ঠা)

হানাফী ফিক্‌হে আছে, হিন্দুস্তানের মুর্খদের মধ্যে এ প্রথা চালু আছে যে, তারা মান্নত মেনে সাইয়্যিদ আহমাদ কাবীরের গুরু এবং শাইখ সাদ্দুর জন্য বকরী যবেহ্ করে। ঐ গরু ও বকরী মৃত জন্তু। কারণ, তারা ওর দ্বারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের সম্মান এবং সৃষ্টজীবের নৈকট্যলাভের ইচ্ছাপোষণ করে। আর যারা একথা বলে যে, যবেহ্‌র সময় আল্লাহর নাম নিলে যব্‌হকৃত জন্তুটি হালাল ও পাক হয়ে যায় যদিও জনগণের নিয়্যাত খারাপ থাকে তাদের এরূপ ধারণা ভুল ধারণা। কারণ,

আল্লাহ ছাড়া অন্যের সম্মানার্থে জানোয়ার মৃত পশু হয়ে যায়। যদিও তাতে কেবলমাত্র আল্লাহরই নাম নেয়া হয়।

(দুররে মুখতারের উর্দু তরজমা গাইয়াতুল আওতার– ৪র্থ ১৭৯ পৃষ্ঠা)

ইবনু আতিয়্যাহ থেকে বর্ণিত; একবার হাসান বাসরীকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, একজন মহিলা তার খেলনার বিয়েতে একটি উট নহর করে। উত্তরে তিনি বলেন, ঐ যবহকৃত জানোয়ারটি খাওয়া যাবে না। কারণ, ওটা সে তার খেলনারূপী ঠাকুরের উদ্দেশ্যে যব্‌হ করেছে। (তাফসীর ইবনু কাসীর– ১ম খণ্ড ২০৬ পৃষ্ঠা)

একদিন 'আয়িশাহ (রাযিঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, অনারবগণ তাদের পরবের উদ্দেশ্যে কিছু জন্তু যবেহ্ করে। অতঃপর তারা তা মুসলমানদেরকে উপহার দেয়। তা খাওয়া যাবে কি না? তিনি বলেন, তারা ঐদিনে যা যবেহ্ করে তা তোমরা খেয়ো না। এমতাবস্থায় তোমরা তাদের গাছের ফল-পাকড় খেতে পার।

(ঐ পৃষ্ঠা– ঐ)

মুজাদ্দিদে আলফে-সানী হানাফী (রহঃ) বলেন, অলী ও দরবেশদের জন্য যে জন্তুগুলো লোকেরা মান্নত করে এবং ওগুলোকে মাযারে গিয়ে যবেহ্ করে– ঐরূপ কাজকে ফিক্‌হ গ্রন্থে শির্কের মধ্যে শামিল করা হয়েছে।

(মাকতুবাতে মুজাদ্দিদে আলফে-সানী– ৩য় খণ্ড ১০৩ পৃষ্ঠা ৪১ নং পত্র)

'আল্লামা শাহ্ 'আব্‌দুল 'আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) বলেন, যে জন্তুগুলো আল্লাহ ব্যতীত অন্যের (মান্নতের) উদ্দেশ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তা শুয়োরের চেয়েও জঘন্য এবং মৃত জন্তু। (মযাহিরে হাক্ব- ৩য় খণ্ড ২৮৯পৃঃ মুরতাদের বিবরণ)

ক্ববরে আযান মনগড়া বিধান

হানাফী মাযহাব মান্যকারীদের একটি দল ব্রেলভীপন্থী। এই ব্রেলভীপন্থীর প্রতিষ্ঠাতা আহমাদ রেযা খান বলেন, ক্ববরে আযান দেয়া মুস্তাহাব তথা পসন্দনীয় কাজ। এর দ্বারা মৃত ব্যক্তি ফায়দা পায়।

(ব্রেলভীয়্যাত– ২৪১ পৃষ্ঠার বরাতে ফাতাওয়া রিয্‌ভিয়্যাহ– ৪র্থ খণ্ড ৫৪ পৃষ্ঠা)

এক ব্রেলভী 'আলিম বলেন, ক্ববরে আযান দিলে শাইত্বন পালায় এবং বারকাত নাযিল হয়। (জাআল হাক্ব– ১ম খণ্ড ৩১৫ পৃষ্ঠা)

ব্রেলভীপন্থীগণ যে মাযহাব মান্য করেন সেই হানাফী মাযহাবের জগদ্বিখ্যাত 'আলিম ও ফকীহ্ 'আল্লামা ইবনুল হুমাম বলেন, ক্ববরের নিকটে সেইসব জিনিস মাকরূহ তথা আপত্তিকর যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। হাদীস থেকে প্রমাণিত কেবলমাত্র একটি জিনিস। তা হল ক্ববর যিয়ারত এবং ওখানে দাঁড়িয়ে দু'আ পড়া।

যেমন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মাদীনার গোরস্তান) জান্নাতুলবাকীতে যিয়ারত করতেন এবং বলতেন– "আস্‌সালা-মু 'আলাইকুম দা-রা ক্বওমিম মু'মিনীন ০ ওয়া ইন্না ইনশা-আল্লাহু বিকুম লা-হিকুন ০ আসআলুল্লাহ লী অলাকুমুল আ-ফিয়্যাহ।" (ফাতহুল ক্বাদীর– ২য় খণ্ড ১০২ পৃষ্ঠা)

'আল্লামা শামী হানাফী বলেন, ক্বরে আযান দেয়া সুন্নাত নয়। ইবনু হাজার তাঁর ফাতাওয়া গ্রন্থে বলেন, ক্ববরে আযান দেয়া বিদ'আত।

(রদ্দে মুহতার– ১ম খণ্ড ৬৫৯ পৃষ্ঠা)

'আল্লামা মাহমুদ বালাখী হানাফী বলেন, ক্ববরে আযান দেয়া ভিত্তিহীন– (তাও্‌শীহ শারহে তানকীহ, রাহে সুন্নাত– ৩৪০ পৃষ্ঠা)। বিদ'আতের মধ্যে একটি বিদ'আত, যা হিন্দুস্তানে চালু হয়েছে তা হল দাফনের পর ক্ববরে আযান দেয়া।

(দুরারুল বিহা-র, রাহে সুন্নাত– ৩৪০ পৃষ্ঠা)

নিম্নে বর্ণিত হানাফী ফিক্‌হের গ্রন্থাবলী দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ক্ববরে আযান দেয়া মাকরূহ তথা ইসলামী শরী'আতে আপত্তিকর কাজ।

(আল-বাহরুর রায়িক– ২য় খণ্ড ১৯৬ পৃষ্ঠা; দুর্‌রে মুখতার– ১৬৬ পৃষ্ঠা; ফাতাওয়া আলমগীরী– ১ম খণ্ড ১৭০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ বিদ'আতীদেরকে উক্ত বিদ'আত থেকে বাঁচার তাওফীক্ব দিন– আমীন!

ক্ববরে খেজুর ডাল পোঁতার বিবরণ

ইবনু 'আব্বাস থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, একবার নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি ক্ববরের পাশ দিয়ে যান। অতঃপর তিনি বলেন, এই ক্ববরবাসী দু'জনের 'আযাব হচ্ছে। অথচ বড় গোনাহের কারণে এদের দু'জনকে 'আযাব দেয়া হচ্ছে না। এদের মধ্যে একজন প্রস্রাবের ছিটে গায়ে লাগা থেকে বাঁচার চেষ্টা করতো না এবং অন্যজন এর কথা ওকে লাগিয়ে বেড়াত। তারপর তিনি একটি রসাল খেজুর ডাল নিলেন। অতঃপর ওটাকে দু'টুকরো করে প্রত্যেকটি ক্ববরে পুঁতে দিলেন। সহাবারা বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনি এরূপ করলেন কেন? তিনি বলল, এই ডাল দুটি যতক্ষণ শুকিয়ে না যাবে ততক্ষণ আশা করা যায় যে, ওদের দুজন থেকে 'আযাব হাল্কা করা হবে। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত– ৪২ পৃষ্ঠা)

উক্ত হাদীসটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কারো ক্ববরে 'আযাব হচ্ছে জানা গেলে ঐ ক্ববরে খেজুর ডাল পোঁতা যেতে পারে। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ২৩ (তেইশ) বছর নাবূওয়াতী জীবনে কেবলমাত্র একবারই ঐ দুটি ক্ববরে

খেজুর ডাল পুঁতে ছিলেন। তিনি আর কোন ক্ববরেই এরূপ করেননি। তেমনি তাঁর লক্ষাধিক সহাবায়ি কিরাম এবং কয়েক লক্ষ তাবিঈনে ইযাম কোন ক্ববরে খেজুর ডাল পুঁতে ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে ক্ববরে 'আযাব হচ্ছে কি না, তা জানাটাও কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব আজকের বিদ'আতী যুগে কোন ক্ববরে খেজুর ডাল পোঁতা উচিতই নয়।

কারণ বিদ'আতী ভায়েরা উক্ত হাদীসটির ভিত্তিতে খেজুর ডালের জায়গায় ক্ববরে ফুল চড়ানোর ব্যবস্থা করেছে। তারপর ঐ ডাল ও ফুল যাতে রোদে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে না যায় তার জন্য তারা ক্ববরে চাদর চড়ানোর প্রচলন চালু করেছে। তারপর ঐ চাদরও যাতে ঝড় বৃষ্টিতে পচে না যায় তার জন্য তারা ক্ববর পাকা ও তাতে গম্বুজ তৈরীর শারী'আত বিরোধী কাজ করেছে। আল্লাহ তাদের সুমতি দিন– আমীন!

ক্ববরের 'আযাব কম করার উদ্দেশ্যে যদি কারো ক্ববরে খেজুর ডাল ও ফুল চড়ানোর দরকার হয় তাহলে তা অলী আল্লাহ এবং পীর ও দরবেশদের ক্ববরে কেন? কারণ অলীদের ক্ববরে 'আযাব হয় কি? তা তো সাধারণ মৃতুব্যক্তির ক্ববরে চড়ানো উচিত। যেমন মাতাল ও জুয়াড়ী, চোর ও ডাকাত, অত্যাচারী ও সলাত পরিত্যাগকারী, দুশ্চরিত্র ও স্বেচ্ছাচারী প্রমুখ লোকদের ক্ববরে ফুল চড়ানো বিবেকের তাগিদ নয় কি? যাতে ওদের ক্ববরের 'আযাব কম হতে পারে। আর ঐ ফুল চড়ানো যদি নেকী পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে হয় তাহলে তা অলীদের তুলনায় পাপীদের জন্য বেশী প্রয়োজনীয় নয় কি?

আমাদের দেশে দেখা যায় যে, অমুসলিমদের বিশিষ্ট ব্যক্তি মারা গেলে তাদের লাশকে ফুল দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। তেমনি মুসলিমদের বিশিষ্ট ব্যক্তি পীর ও ফকির, অলী ও দরবেশদের ক্ববরে ও মাযারে ফুল দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। দুটোরই মধ্যে সাদৃশ্য পাওয়া যায় না কি? অভিজ্ঞতায় জানা যায় যে, যেসব ব্যক্তি মাযারে ফুল চড়ায় এবং যারা ফুল বিক্রি করে তাদের মধ্যে শতকরা নব্বই ভাগ ব্যক্তিই সলাত পরিত্যাগকারী। ঐরূপ সলাত পরিত্যাগকারীদের ফুল চড়ানোতে কোন ক্ববরবাসীর 'আযাব কম হবে কি? কিংবা তার ক্ববরে নেকী পৌঁছবে কি? আল্লাহ আমাদের সুমতি দিন– আমীন!

ক্ববরে যা করণীয় ও বর্জনীয়

নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ববরের উচ্চতা ছিল এক বিঘত এবং সহাবায়ি কিরাম ওর পিঠটাকে উটের কুঁজের মত বানিয়ে দিয়েছিলেন।

(মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক– ৩য় খণ্ড ৫০৩ পৃষ্ঠা)

উহুদের ক্ববরবাসীদের ক্ববরগুলো উটের কুঁজের মত ছিল। (মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক– ৫০৫ পৃষ্ঠা, মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবাহ্– ৩য় খণ্ড ৩৩৪ পৃষ্ঠা)

বিশিষ্ট সহাবী ইমরান ইবনু হুসাইন অসিয়্যত করে ছিল যে, লোকেরা যেন তাঁর ক্ববরটিকে চার আঙুল কিংবা ঐরূপ উঁচু করে।(মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবাহ্– ৩য় খণ্ড ৩৩৫ পৃঃ)

নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজনকে মাটি দিতে তার ক্ববরে হাযির হয়ে সহাবায়ি কিরামকে বললেন, তোমরা তোমাদের সাথীর ক্ববরে বেশী মাটি দিও না। (মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক– ৩য় খণ্ড ৫০৫ পৃষ্ঠা)

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের ক্ববরগুলোতে বুনিয়াদ গড়তে কিংবা ওতে সিমেন্ট লাগাতে অথবা তাতে চাষ করতে নিষেধ করেছেন। কারণ তোমাদের উত্তম ক্ববর সেটা, যেটা চেনাই যায় না।

(মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক– ৩য় খণ্ড ৫০৬ পৃষ্ঠা)

বিখ্যাত সহাবী আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) ও আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন ঃ তোমরা আমার ক্ববরে কোন তাঁবু তৈরী করো না। (মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবাহ্– ৩য় খণ্ড ৩৩৫ পৃষ্ঠা)

সহাবী জাবির হতে বর্ণিত; রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন ক্ববরে সিমেন্ট লাগাতে ও তাতে বুনিয়াদ গড়তে (কিংবা ওতে বাড়তি মাটি ঢালতে) অথবা ওতে কিছু লিখতে। (মুসলিম– ১ম খণ্ড ৩১২ পৃষ্ঠা, আবূ দাউদ– ২য় খণ্ড ১০৪ পৃষ্ঠা)

আবূ মারসাদ গানাভী বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কোন একজনের আগুনের অঙ্গারে বসা, অতঃপর তার কাপড় পুড়ে গিয়ে অঙ্গারটা তার শরীরের চামড়ায় পৌঁছে যাওয়া অনেক ভাল কোন ক্ববরে বসার চেয়ে। (মুসলিম, মিশকাত– ১৪৮ পৃষ্ঠা)

'উকবাহ্ ইবনু 'আমির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আগুনের একটি অঙ্গার কিংবা তলোয়ারের উপরে আমার হাঁটা অথবা আমার জুতাটা আমার পায়েতে সেলাই করে দেয়া আমার নিকটে অনেক ভাল এর চেয়ে যে, আমি কোন মুসলমানের ক্ববরে হাঁটি। আর ক্ববরের মাঝখানে কিংবা বাজারের মাঝখানে আমার পায়খানা করাটা (দুটোই পাপের দিক দিয়ে) সমান। (ইবনু মাজাহ্– ১১৩ পৃষ্ঠা)

আবূ মারসাদ গানাভী বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ক্ববরের দিকে মুখ করে সলাত আদায় করো না এবং ওর উপরে বসবেও না। (মুসলিম, মিশকাত– ১৪৮ পৃষ্ঠা)

বিখ্যাত সহাবী আনাস (রাযিঃ) বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন ক্ববরের মাঝে সলাত পড়তে নিষেধ করেছেন।

(মুসনাদে বায্যার, মাজমাউয যাওয়ায়িদ– ২য় খণ্ড ২৭ পৃষ্ঠা)

ক্ববরের মাহাত্ম্যে কতিপয় জাল হাদীস

'আল্লামা শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) বলেন, ক্ববর পূজারীদের পথভ্রষ্ট হবার একটি কারণ এই যে, ঠাকুর পূজারীগণ নানারূপ জাল হাদীস তৈরী করেছে। সেসব জাল হাদীস এই-

১) **ইযা তাহাইয়্যারতুম ফিল উমূর ফাসতায়ীনূ বি-আহ্লিল কুবূর**- অর্থাৎ তোমরা যখন বিভিন্ন ব্যাপারে হতভম্ব হয়ে যাবে তখন তোমরা ক্ববরবাসীদের দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা করবে।

২) **ইযা আ'ইয়াত্কুমুল উমূর ফাআলাইকুম বি-আসহা-বিল কুবূর**- অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যাপার যখন তোমাদেরকে অক্ষম করে দেবে তখন তোমরা ক্ববরবাসীদেরকে আঁকড়ে ধরবে।

৩) **লাও হাসানা আহাদুকুম যান্নাহূ বিহাজারিন লানাফাআহূ**- অর্থাৎ তোমাদের কেউ যদি কোন পাথরে সু-ধারণা পোষণ করে তাহলে তা তাকে অবশ্যই ফায়দা বা উপকার দেবে। (বালাগুল মু'বীন, উর্দূ তরজমা- ৯১-৯২ পৃষ্ঠা)

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) আরো বলেন, এগুলো ছাড়াও আরো বহু হাদীস মাযার পূজারীগণ মনগড়া তৈরী করেছে। অথচ ঐসব অজ্ঞরা এটা বোঝে না যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এজন্য পাঠিয়েছিলেন যাতে তিনি পাথর ও গাছ দ্বারা লাভ-লোকসান পাবার ধারণা পোষণকারীকে হত্যা করেন। তাই নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবরকম সম্ভাব্য উপায়ে নিজ উম্মাতকে ক্ববরপূজা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছেন।
(বালাগুল মু'বীন, উর্দূ তরজমা- ৯২ পৃষ্ঠা)

ক্ববরপূজারীদের গুমরাহ্ হবার একটা কারণ মিথ্যা কাহিনী। যা তারা নিজেদের সমর্থনে পেশ করে থাকে। ক্ববরপূজারীরা খুবই মিথ্যাবাদী হয়। তারা জ্যান্ত ও মৃত দু'রকম লোকদেরই নামে মিথ্যা তৈরী করে। মানুষ তার অভাব পূরণের ক্ষতি দূর করার জন্য খুবই পেরেশান থাকে। এমতাবস্থায় সে তার ঐ দায় থেকে উদ্ধার পাবার জন্য কোন না কোন উপায় খুঁজে বেড়ায়; যদিও ওর মধ্যে কোন অন্যায়ও থাকে।

এই সময় সে যখন শুনতে পায় যে, অমুক মাযার অভাব পূরণের জন্য অমৃত সমান, তখন সে ওর দিকে দৌড়ে যায় এবং ওর কাছে গিয়ে অত্যন্ত অস্থিরভাবে কান্নাকাটি করে এবং অনুনয়-বিনয় করে প্রার্থনা করে। তখন তার কান্নাকাটিতে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দয়ার দৃষ্টিপাত করেন। ফলে তিনি তার অভাব পূরণ করে দেন। তখন এই অবুঝটা মনে করে যে, এই মাযারে আসার ফলে আমার দু'আটা ক্ববূল হয়েছে। সে এটা জানে না যে, আল্লাহ ব্যাকুল ব্যক্তির ফরিয়াদ অবশ্যই ক্ববূল করেন, যদিও ঐ ব্যক্তি কাফিরও হয়।

ঐ ব্যক্তিটি যদি এরূপ দু'আ কোন বাজারে অথবা দোকানে কিংবা গোসলখানায়ও করত তাহলেও তার অভাব পূরণ করা হত। তাই তার দু'আ ক্ববূলের ব্যাপারে কোন মাযারের প্রভাব আছে ভাবাটা নেহায়েত বোকামী ও আহাম্মকী। কারো দু'আ ক্ববূলের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ভালবাসা যরুরী নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার ও বেঈমান এবং ফাসিক ও পাপী সবারই দু'আ সমানভাবে ক্ববূল করেন। (বালাগুল মুবীন, উর্দূ ছাপা– ৯২-৯৩ পৃষ্ঠা)

ক্ববর ও ইসালে সাওয়াবের আসর

মাযার ভক্ত যেসব ভাইয়েরা শির্ক ও বিদ'আত থেকে বাহ্যিকভাবে দূরে থাকতে চান তারা তাদের ভক্তির পাত্রের মাযারে কোন বার্ষিক অনুষ্ঠান করলে ওর নাম উরস না দিয়ে ইসালে সাওয়াব নাম দেন। তাই ইসালে সাওয়াব কী এবং মাযারে ঈসালে সাওয়াবের অনুষ্ঠান করা বৈধ কি না সে সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল।

আরবী ইসা-ল শব্দের অর্থ পৌঁছানো। আর আরাবী সাওয়াব শব্দের অর্থ পুণ্য ও নেকী প্রভৃতি। তাই ইসা-লে সাওয়ারেব অর্থ দাঁড়ায় নেকী পৌঁছানো। এখন প্রশ্ন ওঠে যে, কোন পীর ও অলীর মাযারে বার্ষিক ইসালে সাওয়াবের অনুষ্ঠান করে কাকে নেকী পৌঁছানো হয়– মৃত পীর ও অলীকে না তাঁর জ্যান্ত ভক্তদেরকে?

কোন জ্যান্ত মুসলিম কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী সাওয়াবের কাজ করলে সে নেকী পেতে পারে। কিন্তু কোন মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর পর কোনরূপ 'আমাল করতে পারে না। তাই তার নেকী করার আর কোন উপায়ই থাকে না। তবে কোন মৃতব্যক্তি যদি তার জীবদ্দশায় তিনটি কাজ করে যেতে পারে তাহলে সে মৃত্যুর পরেও ওর নেকী ক্ববরে পেতে পারে। যেমন আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ)'র বর্ণনায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোন মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তার সব কাজই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কেবল তিনটি নয়। আর তা হলো– সদাক্বায়ে জারিয়াহ্ (অবিরত দান) কিংবা এমন বিদ্যা যদ্দ্বারা উপকার হয়। অথবা এমন সুসন্তান যে তার জন্য দু'আ করে। (মুসলিম, মিশকাত– ৩২ পৃষ্ঠা)

মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আর ব্যাপারে 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাসের বর্ণনায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ক্ববরে মৃত ব্যক্তি একজন সাহায্য কামনাকারী ডুবন্ত ব্যক্তির মত। সে সেই দু'আর অপেক্ষায় থাকে যা তার বাবা অথবা ভাই নতুবা বন্ধুর পক্ষ থেকে তার কাছে পৌঁছায়। অতঃপর তা যখন তার কাছে পৌঁছায় তখন তা তার কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয় হয় দুনইয়া থেকে এবং দুনইয়াতে যা কিছু আছে তা থেকে। আর আল্লাহ তা'আলা যমীনবাসীদের দু'আগুলোকে ক্ববরবাসীদের জন্য বহু পাহাড়ের সমান করে পেশ করেন। এমতাবস্থায় মৃতদের জন্য জীবিতদের উপহার হল তাদের জন্য ক্ষমা চাওয়া।

(বাইহাক্বীর শু'আবুল ঈমান; মিশকাত– ২০৬ পৃষ্ঠা)

উক্ত হাদীস দুটি প্রমাণ করে যে, ক্ববরের ভেতরে শায়িত অলী এবং পীরগণও তাঁদের জ্যান্ত মা-বাবা ও ভাই বন্ধুদের দু'আর একান্ত প্রত্যাশী। এখন আমাদের জানা দরকার যে, সদাক্বায়ে জারিয়াহ্ ও উপকারী বিদ্যা এবং সুসন্তানের দু'আ ও বিভিন্ন আত্মীয়ের দু'আ ব্যতীত আর কোন উপায়ে ইসালে সাওয়াব করা যায় কি না!

হানাফী 'আলিমগণ বলেন যে, সলাত, সিয়াম, হাজ্ব, যাকাত, খয়রাত প্রভৃতির সাওয়াব আমাদের ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে মৃত ব্যক্তিকে পৌঁছায়। (সংক্ষেপিত– আইনুল হিদায়া ১ম খণ্ড ৩৯ পৃষ্ঠা, 'আকায়িদের বর্ণনা)

কিন্তু ইমাম শাফিঈর মতে সদাক্বাহ্ ও আর্থিক ইবাদাতের সাওয়াব এবং বদলী হাজ্বের নেকী মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছায়। এর বিপরীত সলাত ও সিয়াম এবং সবরকম দৈহিক ইবাদাতের নেকী মৃত ব্যক্তি পায় না-শারহু ফিকহি আকবার– ১৫৮-১৫৯ পৃষ্ঠা।

ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মতেও মৃত ব্যক্তির নিকট কারো দৈহিক ইবাদাতের নেকী পৌঁছায় না। (কিতাবুর রূহ উর্দূ তর্জমা– ১৯৮ পৃষ্ঠা)

'হাদ্ইয়াতুল হারামাইন' গ্রন্থের বরাত দিয়ে একটি হাদীস পেশ করা হয় যে, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পুত্র ইব্রহীম যখন মারা যান তখন সহাবী আবূ যার শুকনো খেজুর ও দুধ এবং ঘরের রুটি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমাতে আনেন। তিনি সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওতে সূরা ফাতিহা ও সূরা ইখলাস তিনবার পড়ে হাত তুলে দু'আ করলেন এবং হাতটা মুখে বুলিয়ে নেন। তারপর তিনি সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ যারকে বললেন, এটা বিলিয়ে দাও। আমি এর সাওয়াব আমার পুত্র ইবরহীমকে বখশে দিয়েছি।
(আলমুনকারাত– ৪৪ পৃষ্ঠা)

উক্ত বর্ণনাটি জাল ও মনগড়া। যা মনে হয় বর্তমানে হানাফী ব্রেলভী সমাজে প্রচলিত ফাতিহা প্রথাকে সামনে রেখে অতি চতুরতার সাথে তৈরী করা হয়েছে। তাই হাদ্ইয়াতুল হারামাইন গ্রন্থ প্রণেতা ওর প্রমাণে কোন বরাত পেশ করতে পারেননি। এই বর্ণনাটি সম্পর্কে বিখ্যাত হানাফী 'আলিম 'আল্লামা 'আব্দুল হাই লাখনভী (রহঃ)-এর নিকটে ফাতাওয়া চাওয়া হয়েছিল। উত্তরে তিনি বলেন, এই কাহিনী যা হাদ্ইয়াতুল হারামাইনে লিখা আছে নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলোতে ওর কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না। (মাজমূআ'হ ফাতাওয়া মাওলানা 'আব্দুল হাই– ২য় খণ্ড ৯৮ পৃষ্ঠা; কিতাবুল হযর অল ইবাহাহ্ লাহোর ছাপা)

কতিপয় যঈফ হাদীস ও ইসালে সাওয়াব

- তিরমিযী ব্যাখ্যাকার তুহ্ফাতুল আহ্ওয়াযীর গ্রন্থকার মুহাদ্দিস হিন্দ 'আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, ইমাম নাবাবী তাঁর গ্রন্থ আয্কারে লিখেছেন যে, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ মারআযী বলেন, আমি ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল থেকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, তোমরা যখন গোরস্থানগুলোতে যাবে তখন তোমরা সূরা ফাতিহা, সূরা ফালাক্ব, সূরা আন্-নাস ও সূরা ইখলাস পড়বে এবং তার সাওয়াবটা মৃত ব্যক্তিকে বখশে দাও। তাহলে ঐ সাওয়াব মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে যাবে। ইমাম আহমাদ ছাড়াও অন্যান্য বিদ্বানগণও লিখেছেন যে, ক্ববর যিয়ারতের সময় উক্ত সূরাগুলো এবং অন্যান্য আরো কিছু সূরা পড়লে ওর সাওয়াব মৃত ব্যক্তি পাবে। কিন্তু আমি অনেক খোঁজাখুজির পরেও এ ব্যাপারে যেসব মারফূ হাদীসের উল্লেখ করা হয় সেসবই যঈফ ও দুর্বল সূত্রে পেয়েছি। (কিতাবুল জানায়িয– ১০৩ পৃষ্ঠা)

- ঐসব যঈফ হাদীসের মধ্যে একটি এই যে, আবূ মুহাম্মাদ সমরকন্দী ফাযায়িলে কুলহু অল্লাহু আহাদ গ্রন্থে 'আলী হতে মারফূভাবে বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি ক্ববরের পাশ দিয়ে যাবার সময় 'কুল-হু অল্লা-হু আহাদ' এগারো বার পড়ে ওর সাওয়াবটা মৃত ব্যক্তিদেরকে বখ্শাবে তাকে ঐ গোরস্থানে মৃত ব্যক্তিদের সংখ্যা সমান নেকী দান করা হবে। (কিতাবুল জানায়িয– ১০৩ পৃষ্ঠা)

- ঐসব (যঈফ) হাদীসের মধ্যে একটি এই যে, আবুল কাসিম সা'দ ইবনু 'আলী যানজা-নী তাঁর ফাওয়ায়িদ গ্রন্থে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ক্ববরস্থানে গিয়ে সূরা ফাতিহা, কূল হু অল্লা-হু আহাদ ও আলহা-কুমুত্ তাকা-ছুর পড়বে। তারপরে সে বলবে, হে আল্লাহ! আমি তোমার যে কালাম পাঠ করলাম ওর সাওয়াব এই গোরস্থানের মু'মিন ও মুসলমানদেরকে পৌঁছে দাও। তাহলে ঐসব মুর্দারা আল্লাহ তা'আলার কাছে তার জন্য শাফা'আত করবে। (কিতাবুল জানায়িয– ১০৪ পৃষ্ঠা)

- ঐসব (যঈফ) হাদীসের মধ্যে একটি, যেটাকে 'আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) তাঁর তায্কিরাহ গ্রন্থে সহাবী আনাস হতে মারফূভাবে বর্ণনা করেছেন যে, কোন মু'মিন যখন আ-ইয়াতুল কুর্সী পড়ে মুর্দাদেরকে ওর সাওয়াব বখশে দেয় তখন আল্লাহ তা'আলা পূর্ব ও পশ্চিমের ক্ববরে আলো ভরে দেন এবং তাদের শোয়ার জায়গাকে প্রশস্ত করে দেন। আর ওর পাঠকারীকে ষাট জন নাবীর সাওয়াব দান করেন এবং প্রত্যেক মুর্দার মোকাবিলায় তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। আর প্রত্যেক মৃতের মোকাবিলায় তার জন্য দশটি নেকী লেখা হয়।

উক্ত হাদীসগুলো ইসালে সাওয়াবের জন্য অতি প্রসিদ্ধ। অধিকাংশ 'আলিমগণ ঈসালে সাওয়াবের বর্ণনায় ঐগুলোকে উল্লেখ করেন। কিন্তু এগুলো সবই দুর্বলসূত্রের হাদীস। বিদ্বানগণ এগুলোর যঈফ হবার বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করেছেন। (কিতাবুল জানায়িয- ১০৪ পৃষ্ঠা)

উক্ত যঈফ হাদীসগুলোতে ক্ববরে কুরআন পাঠ এবং ওর নেকী মৃতব্যক্তিদেরকে পৌঁছানোর উল্লেখ আছে। তাই এবার আমাদের জানা দরকার যে, ক্ববরে ও মাযারে কুরআন পাঠ বৈধ কি না?

মাযারে কুরআন পড়া ও হানাফী ফাতাওয়া

বিশিষ্ট হানাফী মুহাদ্দিস 'আল্লামা মোল্লা 'আলী ক্বারী বলেন, ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিক এবং ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর মতে ক্ববরের নিকটে কুরআন পাঠ মাকরূহ। কারণ এটা বিদ'আতী কাজ। যার ব্যাপারে কোন হাদীসই বর্ণিত হয়নি। (শারহু ফিক্বহি আকবার- ১৬০ পৃষ্ঠা)

তাজুশ্ শারীআহ্ মাহমূদ ইবনু আহমাদ হানাফী (মৃত্যু ৬৭৩ হিজরী) শরহে হিদায়াহ্তে লিখেছেন যে, মজুরী নিয়ে যে কুরআন পাঠ করা হয় তা সাওয়াবের যোগ্য হয় না মৃত ব্যক্তির জন্য আর না কুরআন পাঠকের জন্য।

(আনওয়ারে সাত্বিআহ্- ১০৭ পৃষ্ঠার বরাতে রাহে সুন্নাত- ৩৭৮ পৃষ্ঠা)

হানাফী মুহাদ্দিস 'আল্লামা আইনী বলেন, কুরআন পাঠ করে মজুরী গ্রহণকারী ও তা দানকারী দুজনই পাপী। ফলকথা আমাদের যুগে কুরআনের পারাগুলো মজুরী নিয়ে পড়ার যে প্রচলন ছড়িয়ে পড়েছে তা বৈধ নয়।

(বিনায়্যাহ শরহে হিদায়াহ্- ৩য় খণ্ড ৬৫৫ পৃষ্ঠার বরাতে ব্রেলভীয়্যাত- ২২৭ পৃষ্ঠা)

'আল্লামা ইবনু আবিদীন হানাফী বলেন, ঐরূপ করা কোন মাযহাবেই বৈধ নয়। ওর কোন সাওয়াবও পাওয়া যায় না। (মাজমুআহ রসায়িল ইবনু আবিদীন ১ম খণ্ড ১৭৩-১৭৪ পৃষ্ঠার বরাতে বরাতে ব্রেলভীয়্যাত- ২২৮ পৃষ্ঠ)

তিনি আরো বলেছেন, মজুরী নিয়ে কুরআন পাঠ এবং তারপরে ওর সাওয়াবটা কোন মৃত ব্যক্তিকে দান করা কারো থেকে প্রমাণ নেই। কোন ব্যক্তি যখন মজুরী নিয়ে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করে তখন সে এই তিলাওয়াতের কোন সাওয়াব পায় না। তাহলে সে-মৃতব্যক্তিকে কী দান করবে?

(মাজমুআহ রসায়িল ইবনু আবিদীন- ১ম খণ্ড ১৭৫ পৃষ্ঠা)

কিছু লোককে মজুরী দিয়ে কুরআন মাজীদ খতম করানো এবং তারপর ওর সাওয়াবটা মৃত ব্যক্তিকে দান করা এটা সালাফ স্বলিহীনগণদের (সহাবী ও তাবিঈ প্রমুখ) মধ্যে কারো থেকে প্রমাণ নেই। আর না এরূপ সাওয়াব মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত

পৌঁছায়। এটা ঐরূপ যেমন কোন ব্যক্তি মজুরী দিয়ে কোন ব্যক্তি দ্বারা নফল সলাত পড়ালো এবং ওর সাওয়াবটা মৃতব্যক্তিকে দান করল। এর কোন ফায়দাই নেই।
(শরহুল আক্বীদাতিত ত্বহাভিয়্যাহ্– ৫১৭ পৃষ্ঠা)

'আল্লামা 'আব্দুল হাই লাখনভী (রহঃ) বিভিন্ন ফকীহদের বহু বরাত দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, মজুরী নিয়ে কুরআন তিলাওয়াত এবং তাসবীহ্ (সুবহা-নাল্লাহ) ও তাহলীল (লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ-হ) পড়া বাতিল কাজ। এর সাওয়াব মৃতব্যক্তি পায় না এবং পাঠকারীও পায় না। (মাজমূআহ্ ফাতাওয়া মাওলানা 'আব্দুল হাই– ২য় খণ্ড ৮৭ পৃষ্ঠা)

হানাফী ফিক্হের নিম্নলিখিত দুইটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থে আছে, মৃত ব্যক্তিদের জন্য কুরআন তিলাওয়াত করার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা মাকরূহ এবং কুরআন কিংবা সূরা আল-আন্'আম ও সূরা ইখলাস ইত্যাদি পাঠ করার জন্য সৎ লোক ও ক্বারীগণকে সমবেত করা নিষিদ্ধ। (ফাতাওয়ায়ে বায্যাযিয়্যাহ্– ৪র্থ খণ্ড মিসর ছাপা; কিতাবুল হযর অল ইবাহাহ্, ফাতাওয়া শা-মিয়য়াহ্– ১ম খণ্ড ৬০৪ পৃষ্ঠা)

'আল্লামা শাইখ 'আলী মুত্তাকী (শাইখ 'আব্দুল হক্ব দেহলভীর দাদা উসতায) স্বীয় রদ্দে বিদ'আত পুস্তকে লিখেছেন, মৃতব্যক্তিদের জন্য কুরআন পাঠের উদ্দেশ্যে ক্বরস্থানে অথবা মাসজিদে কিংবা বাড়িতে সমবেত হওয়া নিন্দনীয় বিদ'আত। কারণ সহাবায়ি কিরাম থেকে এর প্রমাণ নেই। আর এই কাজ দ্বারা বহুবিধ নিষিদ্ধ ব্যাপার সংঘটিত হয়ে থাকে।

মুহাদ্দিসে হিন্দ শাইখ 'আব্দুল হক্ব দেহলভী (রহঃ) লিখেছেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যুগে মৃতের জন্য জানাযার সলাতের সময় ছাড়া অন্য সময়ে সমবেত হওয়া এবং কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা বা খতম পাঠ করার রীতি ছিল না– ক্বরের কাছে নয়, অন্য স্থানেও নয়। এসব কাজ বিদ'আত এবং মাকরূহ। (মাদারিজুন নাবূওয়াত– ১ম খণ্ড ৪২১ পৃষ্ঠা; কিতাবুল জানায়িয নওলকিশোর ছাপা এবং নাসিরী দিল্লী ছাপার– ৪৬৬ পৃষ্ঠা; শরহে সিফারুস্ সাআদাহ্– ২৭৩ পৃষ্ঠা)

হানাফী ফিকহের বিখ্যাত গ্রন্থ নিসাবুল ইহ্তিসাবে লিখিত আছে, মৃতব্যক্তির জন্য দলবদ্ধ হয়ে উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তিলাওয়াত ফার্সীতে যাকে সিপারা পাঠ বলে– অসিদ্ধ।

হানাফী ফিকহের অপর গ্রন্থ 'খাযানাতুর রিওয়ায়াতে' আছে ক্বরের কাছে কুরআন পাঠ করার জন্য পারিশ্রমিক দিয়ে লোক নিযুক্ত করলে মৃতব্যক্তি বা পাঠক কেউই সাওয়াবের অধিকারী হবে না। উপরিউক্ত দুটি উদ্ধৃতি 'আল্লামা শাইখ মুহাম্মাদ ইসহাক্ব দেহলভীর 'মিয়াতু মাসায়িল' ৫৬ পৃষ্ঠা হতে গৃহীত।

'আল্লামা শাইখ মুহাম্মাদ ইসহাক্ব দেহলভী লিখেছেন– মৃত্যুর তৃতীয় দিবসে

লোকজনকে সমবেত করা এবং কিছু খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা এবং কুরআন মাজীদ সম্পূর্ণ বা ওর কোন অংশ খতম করার উদ্দেশ্যে 'আলিম উলামা এবং সৎলোকদিগকে সমবেত করা মাকরূহ। (আরবায়ীন– ৩৬ পৃষ্ঠা)

'আল্লামা শাইখ 'আব্দুল হাই লাখনভী লিখেছেন– মৃতব্যক্তির তৃতীয় দিন বা অন্য কোন দিন পালন করার জন্য দাওয়াত সূত্রে অথবা বিনা ডাকে লোকজনের একত্রিত হয়ে কুরআন মাজীদের খতম দেওয়ার আবশ্যকতা মুহাম্মাদী শরী'আতে প্রমাণিত নেই। (মাজমুআহ্ ফাতাওয়াহ্– ৩য় খণ্ড ৩৮ পৃষ্ঠা)

'আল্লামা মুজদুদ্দীন ফিরোযাবাদী লিখেছেন, মৃতের জন্য মৃত ব্যক্তির ক্বরে বা অন্য স্থানে সম্মিলিত হওয়া এবং তার জন্য কুরআন খতম করা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যাস ছিল না। এসব কাজ বিদ'আত ও মাকরূহ।

(সিফরুস্ সাআদাহ্– ৪৭ পৃষ্ঠা)

মালিকী ফাতাওয়া

শাইখ ইবনু জাম্‌রাহ বলেন, ক্বরের কাছে কুরআন পড়া সুন্নাত নয়; বরং বিদ'আত (আল মুদখাল। (৩য় খণ্ড ৪৬ পৃষ্ঠা, মিসরী ছাপা)

আর এক মালিকী শাইখ বলেন, কুরআনের কোন অংশ মরণের সময় পড়া এবং মরণের পরে ক্বরে তা পড়া মাক্‌রূহ। কারণ এটা সালাফ স্বলিহীনের 'আমাল নয়। তাঁদের রীতি ছিল মুর্দাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করা এবং আল্লাহর রাহমাত চাওয়া ও ক্বর দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করা।

(শারহুস্ স্বগীর– ১৮০ পৃষ্ঠার বরাতে কুরআন খানী– ৪৯ পৃষ্ঠা)

শাফিঈ ফাতাওয়া

একটি হাদীস– কোন মানুষ মারা গেলে তার সব 'আমাল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়....... এর ব্যাখ্যায় শাফিঈ মুহাদ্দিস ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, কুরআন তিলাওয়াত করে ওর সাওয়াব মৃতব্যক্তিকে বখ্‌শানো এবং মুর্দার তরফ থেকে সলাত প্রভৃতি আদায় করে দেয়ার ব্যাপারে ইমাম শাফিঈ এবং অধিকাংশ 'আলিমের মতে ওর সাওয়াবটা মৃতব্যক্তি পায় না।

(নাবাবী শারহে মুসলিম– ২য় খণ্ড ৪১ পৃষ্ঠা)

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বালের ফাতাওয়া

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল যখন কাউকে ক্ববরের কাছে কুরআন পড়তে দেখতে পেতেন তখন বলতেন, হে অমুক! ক্ববরে কুরআন পড়া বিদ'আত। আর এটা অধিকাংশ সালাফ (সহাবী ও তাবিঈ) দের অভিমত।

তিনি আরো বলেন, মৃত্যুর পরে মৃত ব্যক্তির উপরে কুরআন তিলাওয়াত করা বিদ'আত। তিনি বলেন, সালাফ স্বলিহীনের এটা রীতি ছিল না যে, যখন তারা নফল সলাত আদায় করতেন, কিংবা নফল হাজ্ব করতেন, অথবা কুরআন পড়তেন তখন তাঁরা সাওয়াবটা মুসলিম মৃতব্যক্তিদের জন্য বখ্‌শে দিতেন। তাই সালাফ স্বলিহীনের তরীকা থেকে সরে আসা উচিত নয়।

থাকল এই হাদীস ইক্‌রাউ 'আলা মাউতা কুম সীন অর্থাৎ তোমরা মুর্দার কাছে সূরা ইয়াসীন পড়– এই হাদীসটির সূত্রে গোলমাল আছে এবং এতে অজ্ঞাত পরিচয় রাবীও আছেন। যদি এই হাদীসটাকে সহীহ্ বলে মেনে নেয়া হয় তাহলে এর ভাবার্থ এই নয় যে, মরা ব্যক্তির উপরে ইয়াসীন পাঠ কর। বরং যে ব্যক্তি মারা যাচ্ছে তার কাছে সূরা ইয়াসীন পাঠ কর।

যদি কুরআন পড়ার সাওয়াব মৃতব্যক্তি পেত তাহলে একজন মুসলমানও জাহান্নামে যেত না। কারণ নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব কুরআন পাঠ করে সে ওর প্রত্যেক হরফের বদলে একটি করে নেকী পাবে– আলিফ, লা-ম্, মীম একটি হরফ নয়, বরং আলিফ একটি হরফ। লা-ম্ একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ।

ইবনু হাজার বুতামী বলেন, কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা দ্বারা যদি মুর্দাদের গুনাহ্ মাফ হয় তাহলে ক্ববরগুলোতে টেপরেকর্ড রেখে দেয়া হয়না কেন? যাতে করে দিন ও রাত ক্ববরে কুরআন বাজতে থাকবে এবং কুরআনের আওয়াজে মৃতব্যক্তিদের গুনাহ্ও মাফ হতে থাকবে। (ইহ্দা-উল কিরা'আতি লিল্‌মাইয়্যিত্ এর উর্দু তর্জমা, কুরআন খানী আওর ইসালে সাওয়াব– ৫০-৫১ পৃষ্ঠা)

ইবনু তাইমিয়্যাহ্ ও ইবনুল কাইয়্যিমের ফাতওয়া

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রহঃ) লিখেছেন, ক্ববরের কাছে কুরআন তিলাওয়াত করা মাকরূহ। এমন কি ক্ববরস্থানে কারও জানাযা পড়তে হলে সূরা ফাতিহা পর্যন্ত পাঠ করা চলবে কি না, সে সম্পর্কেও বিদ্বানগণের মতভেদ আছে। ইমাম আহমাদের এক ফাতাওয়াহ্ তাঁর অধিকাংশ প্রাচীন সঙ্গীগণ 'আব্দুল ওয়াহ্হাব অররাক, আবূ বাক্‌র মারওয়াযী প্রমুখ রিওয়ায়াত করেছেন, তদনুসারে ওটা নিষিদ্ধ। এটাই ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক ও হুশাইম ইবনু বাশীর প্রমুখ পূর্ববর্তী

বিদ্বানগণের অভিমত। ইমাম শাফিঈর কাছেও এটা বিদ'আত। ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন, এরূপ কাজ কোন বিদ্বান করেছেন বলে আমি অবগত নই। এতে জানা যায় যে, সহাবা ও তাবিঈগণ এই কাজ করতেন না।

(ইকতিয়া-উস সিরাতিল মুস্তাকীম– ১৮২ পৃষ্ঠা)

হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন, মৃত ব্যক্তিদের জন্য ক্বরের কাছে বা অন্য স্থানে একত্রিত হওয়া, তাদের জন্য কুরআন পাঠ করা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরীকা ছিল না। এসব কাজ বিদ'আত ও নতুন আবিষ্কৃত কাজ যা মাকরূহ। (যাদুল মা'দুল মা'আদ– ১ম খণ্ড ১৯৫ পৃষ্ঠা)

নির্দিষ্ট দিনে ইসালে সাওয়াব অমুসলিমদের কুপ্রভাব

মৃতব্যক্তির জন্য যে কোন সময়েই দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা যাবে এবং তার জন্য দান ও খয়রাতও করা যাবে। হানাফী মাযহাবের মতে বিনা মজুরীতে কুরআন পড়ানোর সাওয়াব এবং সলাত ও সিয়াম পালনের সাওয়াবও মৃতব্যক্তির জন্য পৌঁছানো যাবে কিন্তু এসব উপায়ে মৃতব্যক্তিকে নেকী পৌঁছানোর জন্য কোন দিন নির্দিষ্ট করার প্রমাণ কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যায় না। মাওলানা মুহাম্মাদ সরফরায খান ফাযায়িলে দেওবন্দ বলেন, মনে হয় এই প্রথাটা মুসলমানেরা হিন্দুদের কাছ থেকে নিয়েছে। যেমন বিখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা আলবিরুনী (মৃত্যু ৩৩০ হিজরী) লিখেছেন ঃ হিন্দুদের নিকটে যেসব অধিকার কোন মৃতব্যক্তির উত্তরাধিকারীর উপর বর্তায় তা হল এই যে, দাওয়াত দেয়া, মৃত্যু দিন থেকে এগার ও পনের দিনে খাদ্য খাওয়ানো। এর মধ্যে প্রত্যেক মাসে ছয় তারিখটি উত্তম। এরূপ বর্ষ শেষেও খাদ্য খাওয়ানো জরুরী। নয়দিন পর্যন্ত মৃতব্যক্তির ঘরের সামনে রান্না করা খাদ্য এবং পানির কলসী রাখতে হবে। অন্যথায় মৃতব্যক্তির আত্মা রুষ্ট হবে এবং সে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত অবস্থায় ঘরের চারপাশে ঘুরে ফিরে বেড়াতে থাকবে। তাই দশদিনের মাথায় মৃতব্যক্তির নামে অনেক খাদ্য তৈরী করে দিতে হবে এবং কিছু পানিও দিতে হবে। অনুরূপভাবে এগার দিনেও এরূপ করতে হবে। তিনি আরো লিখেছেন যে, পৌষ মাসের দশ তারিখে তারা হালওয়া রান্না করে দেয়। আর ব্রাহ্মণদের খাওয়া ও পান করার জন্য বাসনপত্র আলাদা হতে হবে।

(রাহে সুন্নাত– ৩৮৫ ও ৩৮৬ পৃষ্ঠার বরাতে কিতাবুল হিন্দ– ২৭০ ও২৮২ পৃষ্ঠার সারাংশ)

এক বিখ্যাত নওমুসলিম 'আলিম মাওলানা 'উবাইদুল্লাহ সিন্ধী (রহঃ) যিনি আগে এক হিন্দু পণ্ডিত ছিলেন। ইনি লিখেছেন– ব্রাহ্মণগণ মরার পর এগারতম দিন এবং ক্ষত্রিয়গণ মরার পরে তেরতম দিন আর বৈশ্যরা মরার পর পনেরতম দিন এবং শূদ্ররা মরার পর একুশ কিংবা একত্রিশতম দিনটি নির্দিষ্ট করে। ঐ নিয়মের

একটি দিন ছয়মাস পরেও আছে। অর্থাৎ মরার ছয়মাস পরে। একটি দিন বার্ষিক দিনও আছে। তাদের নিয়মে একটি দিন গাভীকে খাওয়ানোর দিনও আছে। ওর মধ্যে একটি দিন শুদ্ধিরও আছে অর্থাৎ মৃতব্যক্তির মরার চার বছর পরে। ঐ নিয়মের একটি দিন অসোজ মাসের প্রথম পক্ষ তারা প্রতি বছরে নিজেদের মহান ব্যক্তিদের সাওয়াব পৌঁছায়। তেমনি যে তারীখে কেউ মারা যায় সেই মৃত্যুর দিনটিতে তাকে পুণ্য পৌঁছাতে হবে। মৃতকে খাদ্য খাওয়ানোর পুণ্য পৌঁছানোর নাম শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধের খাবার যখন তৈরী হয়ে যায় তখন প্রথমেই তারা একজন পণ্ডিতকে ডেকে এনে বেদের কিছু মন্ত্র পড়ান। পণ্ডিত যখনই ঐ খাবারে বেদমন্ত্র পড়ে দেন তখন ঐ খাবারের একটি বিশেষ নাম দেয়া হয়। এরূপ তাদের বহু নির্দিষ্ট দিন আছে। (তুহ্ফাতুল হিন্দ– ৯১ পৃষ্ঠা; রাহে সুন্নাত– ৩৮৬ পৃষ্ঠা)

তাই যেসব মাযারে মৃত অলী ও পীরের মৃত্যুদিবসে কিংবা কোন একটি নির্দিষ্ট দিনে ইসালে সাওয়াবের নাম করে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় তা কুরআন ও হাদীস সম্মত হয় কি? এ ব্যাপারে ভারত বিখ্যাত দেওবন্দী 'আলিম মাওলানা রশীদ আহমাদ গাংগোহী (রহঃ) বলেন, নিছক ইসালে সাওয়াবকে কেউই মানা করে না, যদি তা কোন নির্দিষ্ট দিনে না হয়। কিন্তু বিভিন্নরূপ শর্তসাপেক্ষে তা করাটা বিদ'আত এবং ওর সাওয়াবও (মৃতব্যক্তির নিকটে) পৌঁছায় না।

(ফাতাওয়া রশীদিয়্যাহ্– ২য় খণ্ড ৮৪ পৃষ্ঠা; রাহে সুন্নাত– ৩৮১ পৃষ্ঠা)

মাওলানা রশীদ আহমাদ গাংগোহী আর এক ফাতাওয়ায় বলেন, উরসের দিনে ঐ মাযার যিয়ারতে যাওয়াটাও হারাম কাজ।

(ফাতাওয়া রশীদিয়্যাহ্– ২য় খণ্ড ২৯ পৃষ্ঠা; রাহে সুন্নাত– ২৬৬ পৃষ্ঠা)

উক্ত মাওলানা গাংগোহীর ফাতওয়ায় একটি নির্দিষ্ট দিনে কোন অলী ও পীরের মাযারে উরস হারাম এবং বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষে ইসালে সাওয়াবও বিদ'আত তথা ইসলামী শরিয়াত বিরোধী কাজ। তাই যে কোন মাযারে উরস পালনকারী এবং নির্দিষ্ট দিনে ইসালে সাওয়াবের আয়োজনকারী মুসলিম ভায়েরা ঠাণ্ডা মাথায় একটু চিন্তাভাবনা করবে না কি? আল্লাহ তাঁদের এবং আমাদের সবাইকে সুমতি দিন– আমীন!

মৃত অলীগণ জীবিত নন

মাযারভক্ত মুসলমানদের একটি দল বলে যে, আল্লাহর অলী ও পীরগণ মরেও মরেন না। বরং তাঁরা এজগত থেকে পর্দা নিয়ে অন্যজগতে চলে যান ইত্যাদি। তাঁদের এই দাবীর প্রমাণে মাযারভক্তরা কুরআনের একটি আয়াত পেশ করেন। যাতে আল্লাহ বলেন–

اَلاَ اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لاَخَوفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ *

অর্থাৎ– জেনে রাখ, আল্লাহ্র বন্ধুগণ এমন, যাঁদের কোন ভয় নেই এবং তাঁরা চিন্তিতও হবে না। (সূরা ঃ ইউনূস– ৬২ নং আয়াত)

উক্ত আয়াতটির ব্যাখ্যায় হাফিয ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহভীরু হবেন তিনিই আল্লাহর অলী ও বন্ধু হবেন। তাঁরা পরকালের সংকট থেকে ভয় পাবেন না এবং দুনইয়ার ব্যাপারেও তাঁরা চিন্তিত হবেন না। (তাফসীর ইবনে কাসীর– ২য় খণ্ড ৪২৩ পৃষ্ঠা)।

উক্ত আয়াতসহ আল-কুরআনের কোন আয়াত কিংবা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় না যে, আল্লাহর কোন অলী মরে যাবার পরেও জীবিত থাকেন। বরং কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও মহানাবীর হাদীস দ্বারা এর বিপরীতই প্রমাণিত হয়।

১) যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كل نفس ذائقة الموت *

অর্থাৎ– প্রত্যেক প্রাণীই মরণের স্বাদ গ্রহণকারী। (সূরা ঃ আলু-ইমরান– ১৮৫ আয়াত)

২) আল্লাহ তাঁর শেষ নাবীকে সম্বোধন করে বলেন,

انك ميت وانهم ميتون *

অর্থাৎ– (হে মুহাম্মাদ) তুমি নিশ্চয়ই মরণশীল এবং লোকেরা সবই নিশ্চয়ই মরণশীল। (সূরা ঃ আয্-যুমার– ৩০ আয়াত)

৩) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افائن مات اوقتل انقلبتم على اعقابكم *

অর্থাৎ– আর সে (মুহাম্মাদ) তো একজন রসূল মাত্র। ইতোপূর্বে অনেক রসূল গত হয়ে গেছেন, যদি সে মৃত্যুবরণ করে কিংবা নিহত হয় তাহলে তোমরা কি তোমাদের পিছনে (কুফরীর) দিকে ফিরে যাবে?(সূরা ঃ আলু-ইমরান– ১৪৪ আয়াত)

৪) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وما جعلنا لبشرمن قبلك الخلد، افائن مت فهم الخلدون *

অর্থাৎ– হে নাবী! আমি তোমার আগে কোন মানুষেরই জন্য চিরকাল থাকার

ব্যবস্থা করিনি। তাই তুমি যদি মৃত্যুবরণ কর তাহলে ওরা (কাফিররা) চিরকাল বেঁচে থাকবে কি? (সূরা ঃ আম্বিয়া– ৩৪ আয়াত)

৫) আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * ويبقى وجه ربك ذوالجلال والإكرام *

অর্থাৎ– ভূ-খণ্ডে যারা আছে তারা সবাই ধ্বংসশীল। আর বাকী থাকবে গাম্ভীর্য ও মাহাত্ম্যের অধিকারী তোমার প্রতিপালকের সত্ত্বা। (সূরা ঃ আর-রহমান- ২৬ ও ২৭ আয়াত)

৬) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كل شئ هالك الا وجهه *

অর্থাৎ– শুধুমাত্র তাঁর (আল্লাহর) সত্তা ব্যতীত প্রত্যেক জিনিষই ধ্বংসশীল।
(সূরা ঃ আল-ক্বাসাস– ৮৮ আয়াত)

উপরে বর্ণিত ১ম, ৫ম ও ৬ষ্ঠ আয়াত দ্বারা পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, যার মধ্যে প্রাণ আছে সে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে এবং আল্লাহ ব্যতীত যমীন ও আসমানের সব জিনিসই ধ্বংস হবে। ২য়, ৩য় ও ৪র্থ আয়াতগুলোতে শেষ নাবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপারে 'মাওত' শব্দটি স্বয়ং আল্লাহ ব্যবহার করেছেন। সমগ্র কুরআনে কোন নাবীরও শানে ইন্তিকাল বা স্থানান্তরিত হওয়া শব্দও ব্যবহৃত হয়নি। হাদীসেও কারো মরণের ব্যাপারে ইন্তিকাল শব্দ নেই। বরং মওত শব্দটি উল্লিখিত হয়েছে।

যেমন শেষ নাবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর পর-পরই আবূ বাক্র (রাযিঃ) রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লাশকে লক্ষ্য করে বলেন, আমার পিতা আপনার উপর নিদর্শন হোক, হে আল্লাহর নাবী! আপনার উপরে আল্লাহ দুটো মরণ একত্রিত করবেন না। যে মৃত্যু আল্লাহ আপনার জন্য নির্ধারিত করেছেন সে মৃত্যু আপনি বরণ করেছেন। তারপর 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-এর ঘর থেকে তিনি বেরিয়ে এলেন। এমতাবস্থায় 'উমার (রাযিঃ) লোকদের সাথে কথা বলছিলেন। তখন আবূ বাক্র 'উমারকে বললেন, আপনি বসুন। তিনি অস্বীকার করলেন। অতঃপর আবূ বাক্র বললেন, আপনি বসুন। তিনি আবার অস্বীকার করলেন। এবার আবূ বাক্র বক্তৃতা শুরু করলেন। ফলে লোকেরা তাঁর দিকে ঝুঁকলো এবং 'উমার (রাযিঃ)-কে ছেড়ে দিল।

তিনি বললেন, আম্মা-বা'দ তোমাদের মধ্যে যারা মুহাম্মাদকে উপাসনা করতে (তারা জেনে নাও যে,) নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ মৃত্যুবরণ করেছে। আর যারা আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লাহর ইবাদাত করতে (তারা জেনে নাও যে,) নিশ্চয়ই আল্লাহ

জীবিত। তিনি মরেননি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– "অমা মুহাম্মাদুন ইল্লা-রসূল ০ ক্বদ্ খালাত্ মিন ক্ববলিহির রসূল....। অর্থাৎ– মুহাম্মাদ শুধুমাত্র একজন রসূলুন (আল্লাহর দূত) তাঁর আগে রসূলগণ দুনইয়া ছেড়ে চলে গেছেন। অতএব তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন কিংবা নিহত হন তাহলে তোমরা পিছনের (কুফরির) দিকে ফিরে যাবে কি? (বুখারী– ১ম খণ্ড ১৬৬ পৃষ্ঠা)

উক্ত বর্ণনায় আবূ বাক্র (রাযিঃ) রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ষেত্রেও চারবার মৃত্যু শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তা হলো– (১) মাও্তাতাইন; (২) আলমাও্তাহ্; (৩) মুত্তাহা; (৪) ক্বদ মা-তা। এখানে তিনি নাবীজির ক্ষেত্রে 'ইন্তিকাল' শব্দটি ব্যবহার করেননি। তেমনি অন্য কোন নাবীর ক্ষেত্রেও ইন্তিকাল শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। সুলাইমান নাবীর মৃত্যুর বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فلما قضينا عليه الموت مادلهم على موته الا دابة الارض تاكل منساته فلما خرتبينت الجن ان لوكانوا يعلمون

অর্থাৎ– আমি যখন তার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত দিলাম। তখন তার মৃত্যুর সন্ধান জ্বিনদেরকে কেউই দিতে পারেনি যমীনের একটি পোকা (উই) ব্যতীত। যা তার লাঠিটিকে (কুরে কুরে) খাচ্ছিল। অতঃপর সে যখন (যমীনে) পড়ে গেল তখন জ্বিনেরা (তার মৃত্যুটা) জানতে পারল। (সূরা ঃ আস্-সাবা– ১৪ আয়াত)

মাযারভক্তদের কেউ কেউ বলে– "মৃত্যু ক্ববলা আন্ তামূতু" অর্থাৎ তোমরা মরার আগেই মরে যাও। তাই অলীগণ মরার আগেই নিজেদেরকে মেরে ফেলেন। ফলে তাঁরা চিরজীবী হয়ে যান।

উক্ত আরাবী শব্দগুলো কুরআনের কোন আয়াত নয় এবং রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসও নয। বরং ওটা সূফীদের তৈরী একটি প্রবাদ বাক্য। যা কুরআন ও হাদীসের মতে ভিত্তিহীন। ফলে তা দলীলের অযোগ্য। বিধায় তা অমান্যযোগ্য। অতএব কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে এটা পরিষ্কার প্রমাণিত যে, শহীদী মরণ ব্যতীত স্বাভাবিক মৃত্যুবরণকারী কোন অলী ও পীর এবং দরবেশ কিংবা ফকীর মরার পরে জীবিত মোটেই নন। আল্লাহ আমাদের সুমতি দিন– আমীন!

মৃতব্যক্তি শুনতে পায় কি?

মুসলমানদের একটি দল মনে করে যে, মৃত অলী ও পীরগণ যেহেতু মরেন না বরং তাঁরা তাঁদের ভক্তদের কথা শুনতে পান। সেহেতু এ ব্যাপারটাও কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমাদের জানা দরকার। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলকে সম্বোধন করে বলেন–

انك لاتسمع الموتى ولاتسمع الصم الدعاء اذا ولوامدبرين *

অর্থাৎ– হে নাবী! তুমি নিশ্চয়ই মৃতব্যক্তিকে শোনাতে পারবে না এবং কালা বা বধির ব্যক্তিকেও (তোমার) ডাক শোনাতে পারো না যখন সে পিঠ ফিরে চলে যায়। (সূরা ঃ আন্-নামাল– ৮০ আয়াত ও সূরা রূম ৫২ আয়াত)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وما انت بمسمع من فى القبور *

অর্থাৎ– তুমি তাকে শোনাতে পার না যারা ক্ববরগুলোতে আছে।
(সূরা ঃ আল-ফাতির– ২২ আয়াত)

উক্ত তিনটি আয়াতে বলা হয়েছে যে, শেষ নাবী রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও নিজের কথা কোন মৃতব্যক্তিকেই শোনাতে পারেন না। অতএব কোন মৃতব্যক্তিই শুনতে পায় না। চায় তিনি অলী ও দরবেশ হোন কিংবা পাপীতাপী ও সাধারণ ব্যক্তি হন। তবে আল্লাহ্ যদি নিজ কুদরতে বিশেষভাবে কোন মৃতব্যক্তিকে কিছু শোনাতে চান তাহলে তা তিনি শোনাতে পারেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

ولا الاموات، ان الله يسمع *

অর্থাৎ– আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাকে শোনান যাকে তিনি (শোনাতে) চান।
(সূরা ঃ আল-ফাতির– ২২ আয়াত)

একটি হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, বদরের যুদ্ধের পর ঐ যুদ্ধে নিহত মুশরিকদেরকে আল্লাহ তা'আলা শেষনাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কতিপয় কথা শুনিয়েছিলেন। যেমন সহাবী আবূ ত্বলহা বলেন, আল্লাহর নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের দিনে কুরাইশদের ২৪ (চব্বিশ) জন নিহত নেতৃবৃন্দকে বদরের একটি অন্ধকূপে ফেলার নির্দেশ দেন। তারপর তিনি কূপটির মুখে দাঁড়িয়ে তাদের নাম ও তাদের পিতার নাম ধরে ডাকতে লাগলেন, হে অমুকের পুত্র অমুক! হে অমুকের পুত্র অমুক! আল্লাহ্ আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিল আমরা তা সত্যরূপে অবশ্যই পেয়েছি। অতএব তোমরা তা সত্যরূপে পেয়েছ কি, যে ওয়াদা তিনি তোমাদের সাথে করেছিলেন? তখন 'উমার (রাযিঃ) বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি এমন দেহগুলোর সাথে কথা বলছেন যাতে আত্মাই নেই? অতঃপর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাঁর ক্বসম! যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! আমি ওদেরকে যা বলছি তা ওদের চেয়ে বেশী তোমরা শুনতে পাচ্ছ না। হাদীসটির এক বর্ণনাকারী ক্বাতাদাহ্ বলেন, আল্লাহ্ ওদেরকে ঐ সময় জ্যান্ত করেন। যাতে ওদেরকে তিনি তাঁর (নাবীর) কথাগুলো

শুনিয়ে দেন তাদেরকে ডাঁট দিয়ে হেয় বানিয়ে এবং প্রতিশোধ নিয়ে ও আক্ষেপ করিয়ে লজ্জা দিয়ে। (বুখারী, বাবু ক্বতলি আবূ জাহ্‌লিন– ৩য় খণ্ড ৫ পৃষ্ঠা; মিসরী ছাপা)

ইবনু 'উমারের বর্ণনায় আছে, বদরের কুয়াবাসীদের উপর উঁকি মেরে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা কি তা সত্যরূপে পেয়েছ যে ওয়াদা তোমাদের সাথে তোমাদের প্রতিপালক করেছেন? তখন তাঁকে বলা হল, আপনি কি মৃতব্যক্তিদের ডাকছেন? তিনি সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা ওদের চেয়ে বেশী শ্রবণকারী নও। কিন্তু ওরা জওয়াব দিতে পারছে না।
(বুখারী, বাবু ক্বতলি আবূ জাহ্‌লিন– ৩য় খণ্ড ১৬৮ পৃষ্ঠা; মিসরী ছাপা)

'আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-এর বর্ণনায় আছে তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবলমাত্র একথা বলেন যে, এই মুহূর্তে ওরা জানতে পারছে যে, আমি যা বলছি, তা সত্য। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তুমি নিশ্চয়ই মৃতব্যক্তিকে শোনাতে পার না। (ঐ ১৬৯ পৃষ্ঠা)

উক্ত বর্ণনাগুলো প্রমাণ করে যে, আল্লাহ চাইলে কোন কোন মৃত ব্যক্তিকে কারো কথা ও শব্দ তিনি সাময়িকভাবে শুনিয়ে দিতে পারেন। তাই বলে ঐ মুর্দা চিরকাল শুনতে পায় না এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ঐরূপ ব্যতিক্রমী ব্যাপার ছাড়া কোন মুর্দাই শুনতে পায় না। বদরের কুয়াবাসী আবূ জাহাল এবং তার মত ইসলামের দুশমন ও অভিশপ্ত ব্যক্তিগণকে লাঞ্ছিত করার জন্য ঐ মুহূর্তে কেবলমাত্র রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা শোনানো হয়েছিল। ঐ সময় অন্য কারো কথা তাদেরকে শোনানো হয়নি। তেমনি ঐ সময়টি ব্যতীত অন্য কোন সময়েও রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা তাদেরকে শোনানো হয়নি। তাই কোন মুসলিম যেন এই ধোঁকায় না পড়ে যে, মালউন আবূ জাহাল এখনও কারো কথা শুনতে পায়।

অন্য একটি হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, সমস্ত মৃতব্যক্তিকে ক্ববরে শোয়ানোর পর তারা ক্ষণিকের জন্য দাফনকারীদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়। তারপরে তারা আর কিছুই শুনতে পায় না। যেমন বিখ্যাত সহাবী আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (আল্লাহর) কোন বান্দাকে যখন ক্ববরে রাখা হয় এবং তার কাছ থেকে তাকে (দাফনকারী) তার সঙ্গীগণ ফিরে যায় তখন সে তাদের জুতার খটখট শব্দ শুনতে পায়। তখন তার কাছে দুটি মালাইকা আসে। অতঃপর তারা তাকে বসায়। ফের তারা তাকে বলতে থাকে.....। (বুখারী– ১ম খণ্ড ১৬৯ পৃষ্ঠা, মিসরী ছাপা; মিশকাত– ২৪ পৃষ্ঠা)

'উসমান (রাযিঃ) বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুর্দাকে দাফন করা শেষ করতেন তখন তারা (ক্ববরের) কাছে একটু দাঁড়াতেন। অতঃপর

তিনি বলতেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা কর। তারপর আল্লাহর কাছে তার জন্য অটল থাকার প্রার্থনা কর। কারণ এখনই তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে। (আবূ দাঊদ; মিশকাত– ২৬ পৃষ্ঠা)

উপরে বর্ণিত আবূ দাঊদের হাদীসটির বাক্য 'ফাইন্নাহুল আ-ন্ ইয়ুস্আলু' অর্থাৎ এখনই তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে শব্দগুলো প্রমাণ করে যে, আল্লাহর প্রত্যেক বান্দাহকে ক্ববরে দাফন করার পরই দাফনকারীরা ফিরে যাবার সময়ে তাকে ক্ববরে পুনরায় জ্যান্ত করা হয় এবং মুনকার ও নকীর নামক দুই মালাইকা সওয়াল ও জওয়াব করার সময়ে দাফনকারীদের জুতার আওয়াজ তাকে শোনানো হয়। ঐ মালাইকার সওয়াল জওয়াবের পর মুর্দারা আর কিছুই শুনতে পায় না। দাফনকারীদের জুতার আওয়াজের সাথে মুর্দারা তাদের কথা-বার্তা কিংবা অন্য কোন আওয়াজ শুনতে পায় কি না, তা কুরআন ও সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় না।

ক্ষণিকের জন্য জুতার আওয়াজ শোনার হাদীসটি দ্বারা বোঝা যায় যে, মুনকার ও নকীরের ক্ববরে আসার নামমাত্র আগে ইল্লীন বা সিজ্জীন থেকে মুর্দার রূহটি এনে সদ্য ক্ববরে দাফন করা মুর্দাটিকে জ্যান্ত করা হয়। যাতে সে ঐ মালাইকাগণের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে এবং এটা বুঝতে পারে যে, যেসব আত্মীয়-স্বজনের জন্য সে হন্যে হয়ে ফিরত এবং হারাম ও হালাল, বৈধ ও অবৈধ ব্যাপারে কোন পার্থক্যই করত না তারা আজকে তাকে একলা ফেলে চলে যাচ্ছে। তাই তাকে কেবলমাত্র ঐ ফিরে যাওয়া ব্যক্তিদের জুতার আওয়াজটা শোনানো হয়। নতুন আগমনকারীর আওয়াজ নয়। তেমনি ক্ববরের কাছে মওজুদ লোকদের আওয়াজ তাকে শোনানো হয় না এবং সে তা শুনতে পায় না। তাই একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, সদ্য দাফনকৃত ব্যক্তি তার দাফনকারীদের ফিরে যাবার সময়কালীন তাদের জুতার আওয়াজটা ক্ষণিকের জন্য শোনা ছাড়া ক্বিয়ামাত পর্যন্ত কোন মানুষেরই আওয়াজ সে আর মোটেই শুনতে পায় না।

মৃতব্যক্তির শোনা-সংক্রান্ত কতিপয় জাল হাদীস

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ)'র বর্ণনায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "মান সল্লামা 'আলাইয়া ইনদা ক্ববরী সামি'তুহূ..." অর্থাৎ– যে ব্যক্তি আমার ক্ববরের কাছে আমার উপরে সালাম দেয় তা আমি শুনতে পাই।

(বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান; মিশকাত– ৮৭ পৃষ্ঠা)

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আল্লামা 'উবাইদুল্লাহ রহমানী (রহঃ) বলেন, উক্ত হাদীসটি আবূ বাক্‌র ইবনু আবী শাইবাহ্ এবং উক্বইলী ও তাবারানী প্রমুখও রিওয়ায়াত

করেছেন। সবেরই সূত্র এরূপ– "আন্ 'আলা ইবনিল আম্র, আন আবী আব্দির রহমা-ন, 'আনিল আ'মাশ, আন আবী স্ব-লিহ্ আন আবী হুরাইরাহ্ ০ এই সূত্রটা অত্যন্ত জঘন্য যা দলীলযোগ্য নয়। কারণ, এঁদের মধ্যে আলা ইবনু আম্র দুর্বল। যাঁর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা বৈধ নয়। আর আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ ইবনু মারওয়া-ন আস্‌সুদ্দী-সগীর মাতরুকূল হাদীস ও মুত্তাহাম্ বিলকিযব্। অর্থাৎ সুদ্দী-সগীর হাদীসে প্রত্যাখ্যানযোগ্য এবং মিথ্যা বলার দোষে দুষ্ট। হাফিয মুহাম্মাদ ইবনুল হাদী মাকদিসী– আস্ সরিমুল মুনকী গ্রন্থে বলেন, এই হাদীসটি জাল।

(মিরআতুল মাফাতীহ– ২য় খণ্ড ৫২৬ ও ৫২৭ পৃষ্ঠা)

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রহঃ) বলেন, এই হাদীসটি সবারই মতে জাল।

(মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনু তাইমিয়্যাহ্– ২৭ খণ্ড ২৪১ পৃষ্ঠা)

ইবনু আবুদ দুনয়্যা তদীয় কিতাবুল কুবুর গ্রন্থে আবূ হুরাইরাহ্ হতে বর্ণনা করেন, কোন ব্যক্তি যখন কোন কুবরের পাশ দিয়ে যায় যাকে সে চিনত। অতঃপর সে তার উপরে সালাম দেয় তখন মৃতব্যক্তি তার সালামের জওয়াব দেয় এবং তাকে চিনে নেয়। আর যখন সে একটি কুবরের পাশ দিয়ে যায় যাকে সে চিনত না তাকে সে সালাম দেয় তখন মৃতব্যক্তি তার সালামেরও জওয়াব দেয়।

(মিরআত– ২য় খণ্ড ৫০২ পৃষ্ঠা)

হাদীস বিশারদগণ বলেন, ইবনু আবিদ দুন্য়্যার বর্ণিত হাদীসগুলো বিনা যাচাইয়ে গ্রহণ করা যাবে না। তাই উক্ত হাদীসটিও নির্ভরযোগ্য নয়। সুতরাং কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, কোন জীবিত মানুষই কোন মৃতব্যক্তিকে কোন কিছুই শোনাতে পারে না।

মৃতদের শুনতে পাওয়া ও হানাফী ফাতাওয়া

কুরআন ও হাদীসের সরাসরি অনুসরণকারী আহলে হাদীসগণ বিশ্বাস করেন যে, মৃতব্যক্তিগণ আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত শুনতে পায় না। যার প্রমাণ এর আগে কুরআন ও হাদীস থেকে পেশ করা হয়েছে। তথাপি মুসলিমদের কিছু লোক এই ধারণা পোষণ করে যে, মৃত অলী ও পীরগণ নাকি তাঁদের ভক্তদের ফরিয়াদ শুনতে পান? ঐ ধারণা পোষণকারীদের সবাই হানাফী মাযহাব মানেন। তাই মৃতদের শোনার ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের ফাতাওয়া নিম্নে দেয়া হল।

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)'র ছাত্রদের এবং হানাফী 'আলিমদের সর্বসম্মত মতে কারো এ ক্ষমতা নেই যে, সে তার আওয়াযটা কোন মৃত ব্যক্তিকে শোনাতে

পারে। তবে আল্লাহ যখন চাইবেন তখন মুর্দারা শুনতে পারে। আল্লাহর চাওয়া এবং (ক্ববরে) সালাম দেয়া ও (মুর্দার জন্য) দু'আ করার ব্যাপারটা আমরা আগেই জেনেছি। অতএব নিজের বিবেকে আমরা কোন জিনিষকে বাড়াতে পারি না এবং পরকালের জীবনকে এ জগতের সাথে অনুমান করাটাই ভুল। এ ব্যাপারে ফকীহগণ এবং উম্মাতে মুহাম্মদীর 'আলিমগণ একমত।

(আইনুল হিদায়াহ্– ১ম খণ্ড ৭৩২ পৃষ্ঠা; মাইয়্যেতের গুণাবলীর বর্ণনা)

হিদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল কাদীরে আছে, মৃতরা শুনতে পায় না। কারণ তাদের বোধশক্তি নেই। তবে মৃত মানুষের ক্ববরে যিয়ারত আছে, কিন্তু অন্যান্য মৃতের নয়। থাকলো বুখারী শরীফের বর্ণিত বদরের যুদ্ধে নিহত মুশরিকদেরকে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা শোনানোর ব্যাপারটা। তার জওয়াব এই যে, কথা বলাটা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মু'জিযাহ্ (অলৌকিক ঘটনা) ছিল। আর মুসলিম শরীফে বর্ণিত মৃতব্যক্তি জুতার আওয়াজ শুনতে পায়– ওর জওয়াব এই যে, দাফনের শুরুতে এই শোনা ও বুঝতে পারাটা মুনকার ও নকীরের সওয়াল-জওয়াবের ভূমিকা স্বরূপ। (ফাতহুল ক্বাদীর)

হানাফী ফিক্হগ্রন্থ আন্নাহ্রুল ফা-য়িকে আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুর্দাদের সাথে কথা বলা এবং তাদের তা শোনাটা মু'জিযাহ্ হিসেবে ছিল। তাই এর দ্বারা সমস্ত মৃতদের শোনা সাব্যস্ত হয় না। অতএব মু'জিযাহ্ হিসেবেই তো গাছ ও পাথররা নাবীজির সাথে কথা বলেছেন। জুতার আওয়াজ শোনার হাদীসটিকে জোরদার করে অন্য একটি হাদীস। যাতে বলা হয়েছে যে, মুনকার ও নকীর যখন ক্ববরে মু'মিনের জওয়াব শুনে সন্তুষ্ট হন তখন তারা তাকে বলেন, "নাম কা নাও্ মাতিল 'আরূস" অর্থাৎ তুমি বাসর রাতের বর ও কনের মত ঘুমিয়ে পড়। এ হাদীসটি বাহ্যত একথা প্রমাণ করে যে, প্রকৃত মু'মিন ক্ববরের মধ্যে ইহজগত থেকে উদাসীন হয়ে যায়। যেমন ঘুমন্তব্যক্তি উদাসীন থাকে এবং কারো কথাও সে শুনতে পায় না। মোটকথা আমরা আহলে তাক্লীদ (এক ইমামের কথা বিনা দলীলে মান্যকারী) ইজতিহাদ (শরী'আতী গবেষণা) করার শক্তি রাখি না। তাছাড়া আমরা যেসব ফকীহদের মুকাল্লিদ তাদের নিকটে কুরআন ও হাদীসের তথ্য দ্বারা যখন এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, মুর্দারা শুনতে পায় না এবং তারা বুঝতেও পারে না; তখন ঐ ব্যাপারে কথা বলা ও অনুসন্ধান করা বৃথা।

(দুররে মুখতারের উর্দু তর্জমা গাইয়াতুল আওতার– ২য় খণ্ড ৩৯১ পৃষ্ঠা; বাবুল ইয়ামীন ফিয্ যারবি অলক্বতলি)

মৃত অলী ক্ববর থেকে কিছু করতে পারেন কি?

মৃতব্যক্তি শুনতে পায় কি না, সে আলোচনা উপরে করা হয়েছে। এখন তর্কের খাতিরে যদি মেনে নেয়া হয় যে, মৃত অলী-আল্লাহগণ শুনতে পান তাহলে এ প্রসঙ্গও উঠবে যে, তাঁরা তাঁদের ক্ববরে ও মাযারে শোয়া অবস্থায় কিছু করতে পারেন কি না? হানাফী মাযহাব মান্যকারী ব্রেলভীপন্থীদের ধারণা যে, মৃত অলী ক্ববর থেকেও তাঁর ভক্তদের অভাব পূরণ করতে পারেন। যেমন ব্রেলভীপন্থীদের বইয়ে লেখা হয়েছে– মুহাম্মাদ ইবনু ফারগান বলতেন, আমি তাদের মধ্যে যারা নিজেদের ক্ববর থেকে কিছু করতে পারেন। যার কোন প্রয়োজন হবে সে আমার চেহারার সামনে হাজির হয়ে আমার নিকট তার প্রয়োজনের কথা বলুক। আমি তা পূরণ করে দেব। (আনওয়ারুল ইন্তিবাহ ফী হাল্লি নিদা-য়ি ইয়া-রসূলুল্লাহ- মাজমূআহ্ রাসায়িলে রিযভিয়্যাহ, ব্রেলভী সংকলিত– ১ম খণ্ড ১৮২ পৃষ্ঠা; ব্রেলভীয়্যাত– ৩০৫ পৃষ্ঠা)

ইমাম 'আব্দুল ওয়াহ্হাব শা'রানী কাদ্দাসাল্লা-হু সির্রাহু প্রত্যেক বছর সাইয়িদী আহমাদ বাদাভী কাবীর (রহঃ)-এর উরসে হাযির হতেন। একবার তাঁর আসতে দেরি হয়। তখন মাযারের দেখাশোনাকারীগণ বলেন, তুমি কোথায় ছিলে? বারংবার মাযার হতে পর্দা তুলে বলছিলেন, 'আব্দুল ওয়াহ্হাব এসেছে? 'আব্দুল ওয়াহ্হাব এসেছে?

অতঃপর 'আব্দুল ওয়াহ্হাব শা'রানী বলেন, আমার আসার খবর তিনি পেয়ে থাকেন কি? মাযারের তত্ত্বাবধায়কগণ বলেন, খবর কি? তিনি তো বলেন যে, কোন ব্যক্তি কতই না দূর থেকে আমার মাযারে আসার যখন ইচ্ছে করে তখন আমি তার সাথে থাকি। তার রক্ষণাবেক্ষণ করি। (রিসালাহ্ আবর়ারুল মাকাল ফী ক্বিবলাতিল ইজ্লা-ল; মাজমুআহ্ রাসায়িলে রিয্ভিয়্যাহ; ব্রেলভী সংকলিত– ১৭৩ পৃষ্ঠা)

এখন দেখা যাক (এ ব্যাপারে) কুরআন ও হাদীস কী বলে। মুশরিকদের ভক্তির পাত্র সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ان تدعوهم لايسمعوادعاء كم ولوسمعوا مااستجابوا لكم، ويوم القيمة يكفرون بشرككم، ولاينبئك مثل خبير *

অর্থাৎ– তোমরা (মুশরিকরা) যদি ওদের প্রতিমাদেরকে ডাক তাহলে ওরা তোমাদের ডাকে সাড়া দিতেই পারবে না। আর ক্বিয়ামাতের দিনে ওরা তোমাদের শির্ক করাকে অস্বীকার করবে। আর খবরজ্ঞানী আল্লাহর মত কেউই তোমাকে খবর দিতে পারবে না। (সূরা ঃ আল-ফাতির– ১৪ আয়াত)

তৃতীয় খালীফা 'উসমান (রাযিঃ) যখন কোন ক্ববরের কাছে দাঁড়াতেন তখন তিনি কাঁদতেন। পরিশেষে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। তাই তাঁকে বলা হল, আপনি জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা করেন তখন তো কাঁদেন না। অথচ আপনি এই ক্ববরের কারণে কাঁদেন কেন? তিনি বলল, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি এমন কোন দৃশ্য দেখিনি যা ক্ববরের দৃশ্যের চেয়েও বীভৎস হতে পারে। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ্, মিশকাত– ২৬ পৃষ্ঠা)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ)'র বর্ণনায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন কোন মুর্দাকে ক্ববর দেয়া হয় তখন তার কাছে দু'জন কালো নীল চোখ বিশিষ্ট মালাইকা আসে। তাদের দু'জনের একজনের নাম মুনকার এবং অন্যজনের নাম নকীর। অতঃপর তারা দু'জন বলেন, এই লোকটির ব্যাপারে তুমি কী বলতে? সে বলবে, ইনি আল্লাহর দাস ও তাঁর প্রেরিত দূত– রসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, কোন উপাস্যই নেই আল্লাহ ব্যতীত এবং মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দাস ও তাঁর প্রেরিত দূত। তারপর তারা দুজন বলবে, আমরা জানতাম যে, তুমি এ কথাই বলতে। তারপর তার জন্য তার ক্ববরটাকে সত্তরের মধ্যে সত্তুর গজ প্রশস্ত করে দেয়া হবে। তারপর তাকে বলা হবে, আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন। তখন সে বলবে, আমি আমার পরিবারবর্গের কাছে ফিরে যাই। অতঃপর তাদেরকে (এই) খবরটা দিই তখন তারা দুজন বলবে, আপনি বাসর রাতের বর-কনের মত ঘুমিয়ে পড়ুন। যাকে তার সবচেয়ে প্রিয়পাত্র (বর) ছাড়া আর কেউ জাগাতে পারে না। পরিশেষে আল্লাহ তাকে তার এই শোবার জায়গা থেকে (ক্বিয়ামাতের দিন) তুলবেন।

আর যদি সে মুনাফিক্ব হয় তাহলে সে বলবে, আমি লোকদেরকে এরূপ কথা বলতে শুনেছি। ওদের মত আমিও বলতাম। আর কিছুই আমি জানি না! তখন তারা দু'জন বলবে, আমরা জানতাম যে, তুমি ঐ কথাটা বলবে। অতঃপর যমীনকে বলা হবে, একে চেপে ধর। তাই সে তাকে চেপে ধরবে। ফলে তার পাঁজরগুলো ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। এভাবেই সে ওর মধ্যে সর্বদা শাস্তি পেতে থাকবে। পরিশেষে আল্লাহ তাকে তার এই শোবার জায়গা থেকে (ক্বিয়ামাতের দিন) তুলবেন। (তিরমিযী, মিশকাত– ২৫ পৃষ্ঠা)

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাসের বর্ণনায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মৃতব্যক্তি ক্ববরে কেবলমাত্র সাহায্য কামনাকারী ডুবন্ত ব্যক্তির ন্যায়.....।
(বাইহাকীর শু'আবুল ঈমান; মিশকাত- ২০৬ পৃষ্ঠা)

উপরে বর্ণিত প্রথম হাদীসটি প্রমাণ করে যে, ক্ববর হচ্ছে পরকালের প্রথম

স্তর। হাদীসবিশারদগণ বলেন, "মান মা-তা ফা ক্বদ-ক্বা-মাত্ ক্বিয়ামাতুহূ"। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মারা গেল তার ক্বিয়ামাত ক্বায়িম (প্রতিষ্ঠিত) হয়ে গেল।

(মিশকাত– ৪৮০ পৃষ্ঠা)

অতএব যে অলী ও পীর সাহেবকে ক্ববর দেয়া হল তাঁরও ক্বিয়ামাত শুরু হয়ে গেল। এমতাবস্থায় তাঁর পক্ষে ক্ববর থেকে তাঁর ভক্তদের জন্য কিছু করা সম্ভব কি? দ্বিতীয় হাদীসটি প্রমাণ করে যে, মুনকার ও নকীরের সওয়াল-জওয়াবের পর আল্লাহর নেক বান্দাগণ বাসর রাতের মত ঘুমিয়ে পড়েন ক্বিয়ামাত পর্যন্ত। তাই নিশ্চিন্তে ঘুমন্ত কোন অলী ও পীর তাঁর ভক্তদের জন্য ক্ববর থেকে কিছু করতে পারেন কি? তৃতীয় হাদীসটি প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক মৃতব্যক্তিই ডুবন্ত ব্যক্তির মত যিনি অন্যের সাহায্য কামনা করেন। এই হিসেবে মৃত অলী ও পীরগণ জ্যান্ত ব্যক্তিদের দু'আর মুখাপেক্ষী নন কি? অতএব মরার পরে যিনি নিজেই ক্ববরে অন্যের সাহায্যপ্রার্থী তিনি ক্ববর থেকে তাঁর ভক্তদের জন্য কোন কিছু করতে পারেন কি? আল্লাহ সবাইকে সুমতি দিন– আমীন!

মৃত অলীর কিছু করার ক্ষমতা ও হানাফী ফাতাওয়া

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) একবার দেখেন যে, একটি লোক কিছু নেক লোকদের ক্ববরের কাছে এল। অতঃপর সে সালাম দিল এবং তাদেরকে সম্বোধন করলো ও কথা বলল। সে বলল, হে ক্ববরবাসীগণ! আপনাদের নিকট কোন খবর আছে কি? এবং আপনাদের কাছে কোন চিহ্ন আছে কি? আমি আপনাদের কাছে বহু মাস ধরে এসেছি। এমতাবস্থায় আমার কোন কামনাই নেই কেবলমাত্র দু'আ ব্যতীত। অতএব আপনারা তা জানতে পেরেছেন কি, না কি আপনারা (তা থেকে) উদাসীন রয়েছেন।

অতঃপর ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) ওঁদেরকে (মৃত অলীদেরকে) সম্বোধন করা অবস্থায় সেই লোকটির কথাগুলো শুনতে পান। তখন তিনি তাকে বলেন, ওঁরা তোমার ডাকে সাড়া দিলেন কি? সে বলল, না। এবার তিনি তাকে বললেন, ধিক তোমার জন্য! তোমার হাত দুটি মাটিতে মিশে যাক! তুমি সেসব দেহের সাথে কীভাবে কথা বলছ, যাঁদের জওয়াব দেবার ক্ষমতাই নেই এবং কিছু করারও ক্ষমতা নেই? আর তাঁরা কোন আওয়াজও শুনতে পান না। তারপর তিনি (কুরআনের আয়াত) পড়লেন, অমা আন্তা "বিমুস্‌মিয়ি'ম মান ফিল কুবুর" অর্থাৎ– যারা ক্ববরে আছে তাদেরকে তুমি শোনাতে পারবে না। [গারা-য়িব ফী তাহ্‌কীকিল মাযাহিব এর বরাতে মাওলানা বাশীরুদ্দীন কনৌজী, (মৃত্যু ১২৯৬ হিজরী) এর তাফ্‌হীমুল মাসায়িল স্থাবর পারাস্তী– ১৫ ও ১৬ পৃষ্ঠা)]

'আল্লামা আলূসী বাগদাদী হানাফী বলেন, কোন সৃষ্টজীব দ্বারা সাহায্য কামনা করা এবং তাঁকে ওয়াসীলা বা মাধ্যমে পরিণত করা এই অর্থ যে, তাঁর থেকে দু'আ চাওয়া হবে ওর বৈধতার ব্যাপারে কোন সন্দেহই নেই যদি দু'আ চাওয়ার ব্যক্তিটি জ্যান্ত হয় তবে। আর দু'আ চাওয়ার ব্যক্তিটি যদি মৃত হয়, কিংবা সামনে অনুপস্থিত থাকে তাহলে কোন 'আলেমই এই সন্দেহ করে না যে, ঐ কাজটা বৈধ নয় এবং ওটা এমন বিদ'আতের মধ্যে গণ্য, যা সালাফদের (সহাবী ও তা-বিঈদের) মধ্যে কোন ব্যক্তিই করেননি। (তাফসীর রূহুল মা'আনী– ২য় খণ্ড ২৯৭ পৃষ্ঠা ১৩০১ হিজরী, ২য় সংস্করণ)

'আল্লামা শা-মী হানাফী বলেন ঃ "ইন্ যুন্না আন্নাল মাইয়িতা ইয়াতাসার্‌রাফ্ ফিল উমুরি দূনাল্লা-হি ই'তিক্বা-দুহূ যা-লিকা কুফ্‌রুন" অর্থাৎ যদি এই ধারণা পোষণ করা হয় যে,মৃতব্যক্তি বিভিন্ন ব্যাপারে হেরফের করতে পারে আল্লাহকে ছেড়ে তাহলে এরূপ মনোবিশ্বাস কুফরী 'আক্বীদাহ্। (রদ্দুল মুহ্‌তার– ২য় খণ্ড ১৭৫ পৃষ্ঠা)

উক্ত সমস্ত বর্ণনাগুলো প্রমাণ করে যে, কোন মৃতব্যক্তিই চায় তিনি অলী ও পীর হোন কিংবা দরবেশ ও ফকীর হোন– ক্ববর থেকে কারো জন্য কিছু করতেই পারেন না। যদি কেউ ওর বিপরীত ধারণা পোষণ করে তাহলে সে কুরআন ও হাদীস এবং হানাফী ফিকহের বিরোধী ধারণা পোষণ করে। যা কুফরী ও শির্কী ধারণা। আল্লাহ আমাদের হিফাযাত করুন– আমীন!

বিভিন্ন অলীর মাযার-ভ্রমণ বৈধ কি না

বিভিন্ন অলীর মাযার ভ্রমণের কারণ দু'ধরনের হতে পারে।

এক. কোন মাযারে গিয়ে একথা বলা যে, আপনি আমার ফরিয়াদ শুনুন এবং আমার দুঃখ-দুর্দশা দূর করে দিন। আর আমার অভাব পূরণ করে দিন। এরূপ ফরিয়াদ করা ও সাহায্য চাওয়া পরিষ্কার শির্ক।

দুই. কোন মাযারে গিয়ে একথা বলা যে, আপনি আমার জন্য দু'আ করুন যে, আল্লাহ যেন আমার বালা-মুসীবত দূর করে দেন এবং আমার প্রয়োজন মিটিয়ে দেন। এরূপ করাও জঘন্য বিদ'আত এবং পরোক্ষ শির্ক। কারণ সহাবী ও তাবিঈ এবং তাবা-তাবিঈদের যুগে এরূপ কাজ কেউই করেননি।

হানাফী বিদ্বানের লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ শারহে মাওয়াক্বিফে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, (মুতাযিলাদের) স্বলিহী উপদল মৃত ব্যক্তিদের জন্য কিছু বুঝা ও করার ক্ষমতা রাখা এবং ইচ্ছাশক্তি ও শোনা আর দেখাকে বৈধ বলে। ওদের মতানুসারে এটা অপরিহার্য হয়ে যায় যে, যেসব মানুষ ঐসব গুণে গুণান্বিত তারা মৃত নন এবং স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহও জ্যান্ত নন। (করাচী ফারান পত্রিকা তাওহীদ সংখ্যা– ১২৬-১২৮ পৃষ্ঠা)

মুসলমানদের মধ্যে যারা এরূপ ধারণা পোষণ করেন যে, অলী ও পীরগণ কবরে থেকেও কিছু করতে পারেন তাঁরা অলীদের মাযারে চক্কর দেন এবং কিছু পাবার আশা করেন। তাই এ ব্যাপারেও আমাদের জানা দরকার যে, বিভিন্ন মাযার ভ্রমণ প্রকৃত ইসলামী মতে কতটা সিদ্ধ। বিখ্যাত সহাবী আবূ সায়ীদ খুদরীর বর্ণনায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– "লু-তুশাদ্দুর রিহা-ল ইল্লা ইলা-সালা-সাতি মাসা-জিদা ০ মাসজিদুল হারাম অল মাসজিদুল আক্বসা অমাসজিদী হা-যা"। অর্থাৎ– (নেকী লাভের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না কেবলমাত্র তিনটি মাসজিদ ছাড়া আর তা হলো– (মাক্কার) মাসজিদুল হারাম ও (যেরুজালেমের) মাসজিদুল আক্বসা ও (মাদীনায় অবস্থিত) আমার এই মাসজিদ।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত– ৬৮ পৃষ্ঠা)

তূর পর্বতে মূসা (আঃ)-এর উপর তাওরাত নাযিল হয়েছিল। ফলে ঐ জায়গাটিকে অনেকে বারকাতময় জায়গা ভেবে ওতে সলাত আদায় করতে চাইত। তাই শাহর ইবনু হাওশাব বলেন, আমি তূর পর্বতে সলাত পড়বার ব্যাপারটা উল্লেখ করলে সহাবী আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)-কে বলতে শুনলাম, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন মুসল্লীর জন্য এটা উচিতই নয় যে, সে কোন মাসজিদের দিকে সফর করবে তাতে সলাত পড়ার উদ্দেশ্য তবে মাসজিদুল হারাম, মাসজিদুল আক্বসা ও আমার মাসজিদ ব্যতীত।

(মুসনাদে আহমাদ, ফাতহুল বারী– ৩য় খণ্ড ৬৫ পৃষ্ঠা)

সুনানের গ্রন্থাবলীতে বাস্‌রাহ ইবনু আবূ বাস্‌রাহ গিফারীর বর্ণনায় আছে, বিখ্যাত সহাবী আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) তূর পর্বত থেকে ফিরে আসার পর উক্ত গিফার (রাযিঃ) তাঁকে বলেন, আমি যদি আপনাকে তূরে রওয়ানা হবার আগে পেতাম তাহলে (উক্ত হাদীসটি শুনলে) আপনি ওখানে যেতেন না।

(সুনানে আন্‌-নাসাঈ– ১ম খণ্ড ১৬০ পৃষ্ঠা)

উক্ত হাদীসটির বাহ্যিকভাব দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, মাক্কার মাসজিদে হারাম ও মাদীনার মাসজিদে নাবাবী এবং যেরুজালিমের মাসজিদে আক্বসা ব্যতীত আর কোন বিশেষ জায়গায় বারকাত লাভের উদ্দেশ্যে ও সলাত আদায়ের উদ্দেশ্যে সফর করা সিদ্ধ নয় অর্থাৎ নিষিদ্ধ। ইমাম আবূ মুহাম্মাদ জুআইনী এবং কাযী হুসাইন ও কাযী ইয়ায প্রমুখের মত তাই। তাঁদের দলীল উপরে বর্ণিত বুখারী ও মুসলিম এবং নাসাঈতে বর্ণিত হাদীসগুলো। এ ব্যাপারে ভারতগুরু শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) বলেন, ইসলামের আগে মুশরিকরা তাদের ধারণা অনুযায়ী সম্মানিত জায়গাগুলোর যিয়ারত করত এবং তাতে বারকাত হাসিল করত। এতে যেহেতু আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদাত করার দরজা খুলে যায় সেহেতু এই বিকৃতিটাকে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বন্ধ করে দিয়েছেন। তাই আমার

নিকট সত্য এই যে, যে কোন একটি ক্ববর এবং অলীদের মধ্যে কোন অলীর ইবাদাতের জায়গা ও তূর পর্বত সবই সমান, উক্ত নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে।

(হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্– ১ম খণ্ড ১৯২ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ কোন মাযার এবং কোন মৃত অলীর ইবাদতগৃহ (খানকাহ) এবং তাওরাত নাযিলের জায়গা তূর পর্বতে নেকী ও বারকাতলাভের উদ্দেশ্যে সফর করা নিষিদ্ধ। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ (রহঃ) অন্য এক জায়গায় বলেন, যে ব্যক্তি আজমীরে খাজা (মুয়নুদ্দীন) চিশতীর মাযার কিংবা সালার মাসউদ গাযীর মাযার অথবা ওর মত যে কোন মাযারে এ জন্য গেল যে, সে ওখানে দু'আ করবে এবং তার দু'আ সেখানে কবূল হবে–তাহলে সে এমন পাপ করবে যে, সে পাপ হত্যা করা ও ব্যভিচারের চেয়েও জঘন্যতম পাপ হবে।

(তাফ্হীমাতে ইলা-হিয়্যাহ্– ২য় খণ্ড ৪৯ পৃষ্ঠা; রাহে সুন্নাত– ২৬১ পৃষ্ঠা)

কিছু 'আলিমের মতে উক্ত তিনটি মাসজিদ ব্যতীত অন্য জায়গায় যিয়ারত করতে যাওয়া আপত্তিকর নয়। (ইরশাদুস সারী– ২য় খণ্ড ৩৩০ পৃষ্ঠা)

কেউ যদি উক্ত মাসজিদগুলো ব্যতীত কোন জীবিত নেক্কার লোকের দর্শনে কিংবা বিদ্যার অন্বেষণে অথবা ব্যবসা কিংবা বেড়াবার উদ্দেশ্যে সফর করে তাহলে তার ঐ সফরটা উপরে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না।

(ফাতহুল বারী– ৩য় খণ্ড ৬৫ পৃষ্ঠা)

ফলকথা প্রত্যেক মুসলিমের বাড়ির কাছাকাছি যে কোন ক্ববর যিয়ারত করা নাবীজির সুন্নাত। কিন্তু বাড়ি থেকে দূরে যে কোন মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করাটা মতভেদী ব্যাপার। উক্ত হাদীসের বাহ্যিকভাব অনুসারে অধিকাংশ 'আলিমের মতে ঐরূপ সফর শারী'আত বিরোধী। আর কিছু 'আলিমের মতে ঐ হাদীসের পরোক্ষভাবের ব্যাখ্যানুসারে ঐরূপ সফর আপত্তিকর নয়।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রহঃ) বলেন, কেউ যদি কোন নাবী কিংবা অলীর ক্ববরে সলাত পড়া কিংবা দু'আ চাওয়ার জন্য আসে তাহলে তা কোন ইমামেরই নিকট পসন্দনীয় কাজ নয়। সহীহ্ হাদীসে তা মানা করা হয়েছে। কিন্তু ক্ববরবাসীর জন্য দু'আ করার উদ্দেশ্য থাকলে ক্ববরের যিয়ারত জায়িয। যেমন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতুল বাকীর ক্ববরগুলোর যিয়ারতের জন্য যেতেন। (আর রদ্দু আলাল ইখ্নায়ী)

আল্লামা আনয়ার শাহ কাশ্মীরী হানাফী বলেন, অলীদের ক্ববর যিয়ারত করা যা বর্তমান যুগের লোকদের অভ্যাস তার জন্য শারী'আতের বাহক সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে কিংবা মাযহাবওয়ালার পক্ষ থেকে দলীল চাই। শহরের সংলগ্ন যিয়ারতের সাথে অলীদের যিয়ারতকে ক্বিয়াস করা বৈধ নয়।

(আল-আরফুশ শাযী– ১৬৪ পৃষ্ঠা)

মাযারের তোহ্‌ফা রকমারি সূতা

ইদানিং কিছু বিশেষ মাযার যেমন আজমীরের খাজা ময়নুদ্দীন চিশ্‌তীর মাযার ও বাঁশ ব্রেলভীর মাযার থেকে লাল সূতার উপহার দেয়া হচ্ছে। যা কিছু মুসলমান হাতে পরছেন। যাঁরা তা পরছেন তারা হয়ত মাযারের বারকাত ভেবে তা পরছেন কিংবা কোন কিছু না ভেবেই ভক্তির আতিশয্যেও তা হয়ত পরছেন। তাই এটা আমাদের জানা দরকার যে, ঐরূপ সূতা ও ফিতা পরা কতটা ইসলাম সম্মত।

বিখ্যাত সহাবী 'আব্‌দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিঃ)-এর স্ত্রী যায়নাব হতে বর্ণিত হয়েছে যে, একদিন 'আব্‌দুল্লাহ আমার গলায় একটি সূতা দেখতে পান। তখন তিনি বলেন, এটা কী? আমি বললাম, এটা একটি সূতা, যাতে আমার জন্য মন্ত্র পড়ে দেয়া হয়েছে। যায়নাব বলল, অতঃপর তিনি ('আব্‌দুল্লাহ্) সেটাকে ধরলেন এবং তা কেটে ফেললেন। তারপর তিনি বললেন, তোমরা 'আব্‌দুল্লাহর পরিবার শির্ক থেকে মুক্ত। আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই মন্ত্র ও মাদুলী এবং সূতা-ফিতা শির্ক। অতঃপর আমি বললাম, আপনি এরূপ বলছেন কেন? কারণ আমার চোখে কষ্ট ছিল এমতাবস্থায় আমি এক ইয়াহুদীর কাছে প্রায় যেতাম। অতঃপর তিনি যখন ওতে ঝাড়ফুঁক দিতেন তখন তা শান্ত হত। তখন 'আব্‌দুল্লাহ বলল, ওটা তো কেবলমাত্র শাইত্বনী কাজ। সে ওটাকে তার হাত দিয়ে চোট করে দিত। তাই ওতে যখন ঝাড়ফুঁক করা হত তখন তা কষ্ট থেকে বিরত থাকত। তোমার জন্য কেবলমাত্র তা বলা যথেষ্ট যা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন–

বাংলা উচ্চারণ ঃ "আয্‌হিবিল বা-স্ রব্বান না-স্ আশ্‌ফি আন্তাশ্ শা-ফী লা-শিফা-আ ইল্লা-শিফা-উকা শিফা-আন লা- ইয়ুগা-দিরু সাক্বামান।"

অর্থাৎ– হে মানুষের প্রতিপালক! কষ্ট দূর কর এবং আরোগ্য দান কর। তুমিই তো আরোগ্য দানকারী। তোমার আরোগ্য ব্যতীত আর কোন আরোগ্যই নেই। তা এমন আরোগ্য যা কোন রোগকেই অবশিষ্ট রাখে না।

(আবূ দাঊদ; মিশকাত– ৩৮৯ পৃষ্ঠা)

অতএব কোন মৃত অলীর মাযার থেকে দেয়া লাল ও কালো কিংবা যে কোন সূতা অথবা হাতের বালা প্রভৃতি দেয়া জিনিষকে তাবার্‌রুক বা বারকাতলাভের উদ্দেশ্যে পরা কিংবা ব্যবহার করা উক্ত হাদীসের আলোকে বৈধ হবে কি? আল্লাহ আমাদের সুমতি দিন– আমীন!

মাযার ও সলাতের ব্যাপার

ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কোন ক্ববরের দিকে মুখ করে সলাত পড় না এবং কোন ক্ববরের উপরেও সলাত আদায় করো না।

(তাবারানী কাবীর, মাজমাউয যাওয়ায়িদ- ২য় খণ্ড ২৭ পৃষ্ঠা)

আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন ক্ববরের মাঝে সলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

(মুসনাদে বায্যার, মাজমাউয যাওয়ায়িদ- ২য় খণ্ড ২৭ পৃষ্ঠা)

বিখ্যাত তাবিঈ আম্র ইবনু দীনারকে ক্ববরগুলোর মাঝে সলাত পড়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বানী ইসরাঈলরা তাদের নাবীদের ক্ববরগুলোকে মাসজিদ বানিয়ে নিয়েছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন। (মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক)

প্রথমোক্ত দুটি হাদীস প্রমাণ করে যে, কোন ক্ববরের উপরে এবং কোন ক্ববরের কাছেও সলাত পড়ার অর্থ ক্ববরকেই মাসজিদ বানিয়ে নেয়া। 'আল্লামা মানাভী (রহঃ) ফাইযুল ক্বাদীর গ্রন্থে 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বর্ণিত একটি হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, ইয়াহুদী ও খ্রীস্টানরা তাদের বাতিল ধ্যানধারণার বশবর্তী হয়ে (নাবীদের) ক্ববরগুলোকে কিবলা বানিয়ে নেয়। তাই তারা ক্ববরের দিকে মুখ করে সলাত পড়তে থাকে। এভাবে ক্ববরকে সজদার জায়গা বানানোর অর্থই হল ক্ববরে মাসজিদ তৈরী করা। 'আল্লামা বায়যাভী বলেন, ইয়াহুদীরা তাদের নাবীদের সম্মানে তাঁদের ক্ববরগুলোকে সজদাহ্ করত এবং ঐ ক্ববরগুলোকে তারা ক্বিবলা বানিয়ে ওর দিকে মুখ করে সলাত পড়ত। এভাবে তারা নাবীদের ক্ববরগুলোকে ঠাকুর বানিয়ে নিয়েছিল। তাই আল্লাহ ইয়াহুদীদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন। ('আল্লামা আলবা-নীর তাহযীরুস সা-জিদ্ আন্ ইত্তিখা-যিল কুবূরি মাসাজিদ-এর উর্দু তর্জমা- ২৭-২৮ পৃষ্ঠা)

কোন ক্ববরকেই মাসজিদে পরিণত করা যাবে না। তাই সহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনু হারিস নাজরানী হতে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার তিনি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাঁর মরণের পাঁচদিন আগে বলতে শোনেন, খবরদার! তোমাদের আগে যারা ছিল তারা তাদের নাবী ও তাদের নেক্কার লোকদের ক্ববরগুলোকে মাসজিদে পরিণত করে নিত। তাই আমি তোমাদেরকে তা থেকে মানা করছি।

(মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবাহ্- ২য় খণ্ড ৩৭৬ পৃষ্ঠা)

'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রোগ থেকে সেরে উঠতে পারেননি সেই সময় তিনি বলেন, আল্লাহ

ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে অভিশম্পাত করুন। যারা তাদের নাবীদের কবরগুলোকে মাসজিদ বানিয়ে নিয়েছে। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত– ৬৯ পৃষ্ঠা)

'আয়িশাহ্ ও ইবনু 'আব্বাস হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে মরণ যখন হাযির হয় তখন তিনি মরণের কষ্টের কারণে তাঁর চাদরের একটা কোণ নিজের চেহারার উপরে রাখছিলেন এবং কখনো তা মুখ থেকে সরাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি বলছিলেন, আল্লাহর অভিশাপ হোক ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের উপর। তারা তাদের নাবীদের কবরগুলোকে সজদাহ্'র স্থান বানিয়ে নিয়েছিল। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বললেন, তিনি সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মাতকে সেই বিষয় থেকে সতর্ক করছিলেন যা ইয়াহুদী ও খৃস্টানরা করেছিল। (বুখারী– ১ম খণ্ড ৬৪ পৃষ্ঠা; মুসনাদে দারিমী– ১ম খণ্ড ৩২৬ পৃষ্ঠা)

'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অসুখে পড়েন তখন তাঁর কতিপয় স্ত্রী আবিসিনিয়ায় অবস্থিত 'মারিয়াহ্' নামক একটি গির্জার আলোচনা করেন। (রসূলুল্লাহর দুই স্ত্রী) উম্মু সালামা ও উম্মু হাবীবাহ্ (হিজরতের সময়) আবিসিনিয়ায় ছিলেন। তাই তাঁরা এই গির্জার সৌন্দর্য এবং ছবিগুলোর আলোচনা করেন। হাদীসটির বর্ণনাকারিণী 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন, অতঃপর নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথাটা তুলে বললেন, ওদের মধ্যে যখন কোন সৎলোক থাকত তখন ওরা তার কবরে মাসজিদ তৈরী করে নিত। তারপর ওরা তার ছবিও বানাত। ওরাই ক্বিয়ামাতের দিনে আল্লাহর নিকটে নিকৃষ্টতম সৃষ্টিজীব হবে।(বুখারী– ১ম খণ্ড ৬৪ পৃঃ; তাবাক-তু ইবনু সা'দ– ২য় খণ্ড ১৮৪পৃঃ)

বিখ্যাত সহাবী জুনদুব (রাযিঃ) বলেন ঃ আমি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, খবরদার! তোমাদের আগে যারা ছিল তারা নিশ্চয়ই তাদের নাবীদের এবং তাদের সৎলোকদের কবরগুলোকে মাসজিদ বানিয়ে নিত। খবরদার! তোমরা কবরগুলোকে মাসজিদ বানিও না। আমি অবশ্যই তোমাদেরকে তা থেকে মানা করছি। (মুসলিম, মিশকাত– ৬৯ পৃষ্ঠা)

কবরকে মাসজিদ বানানোর ব্যাখ্যা

উপরে বর্ণিত কতিপয় হাদীসে কবরকে মাসজিদ বানানোর উল্লেখ আছে। ওর ব্যাখ্যায় 'আল্লামা ইবনু হাজার মাক্কী (রহঃ) বলেন, কবরকে মাসজিদ বানানোর অর্থ কবরের দিকে মুখ করে সলাত আদায় করা। (কাবরুঁ পর মাসাজিদ কী তা'মীর ২৫ পৃষ্ঠার বরাতে আয্ যাওয়া-জির ফিন্ নাহ্য়ি আন ইক্বতিরা-ফিল কাবা-য়ির– ১ম খণ্ড ১২১ পৃষ্ঠা)

ইমাম শাফিঈ (রহঃ) বলেন, আমি এটাকে আপত্তিকর তথা হারাম মনে করি

যে, ক্ববরের উপরে মাসজিদ তৈরী করা হোক, কিংবা এমন ক্ববরের উপরে সলাত পড়া হোক যা প্রকাশ্য ক্ববর অথবা ক্ববরের দিকে মুখ করে সলাত পড়া হোক।
(কিতাবুল উম্ম– ১ম খণ্ড ২৪৬ পৃষ্ঠা)

হানাফী মুহাদ্দিস মোল্লা 'আলী ক্বারী বলেন ঃ ইয়াহুদী ও নাসরাদের অভিশপ্ত হবার কারণ এই ছিল যে, তারা তাদের নাবীদের ক্ববরগুলোকে সাজদাহ্ করত। এটা প্রকাশ্য শির্ক। কিংবা অন্য কারণও ছিল যে, তারা সলাত পড়ার জন্য এমন জায়গার নির্বাচন করত যেখানে নাবীগণ ক্ববরে শুয়ে আছেন। তারা ওঁদের ক্ববরগুলোতে সাজদা করত এবং ঐ ক্ববরগুলোকে তারা ক্বিবলা বানিয়ে সলাত আদায় করত। তারা এটা ভাবত যে, এভাবে আল্লাহর ইবাদাত হয়ে যাবে এবং নাবীদেরও অত্যধিক সম্মান দেখানো হবে। অথচ এটাও শির্ক। তবে এটা অপ্রকাশ্য শির্ক। কারণ এতে সৃষ্টিজীবের এমন সম্মান প্রদর্শন পাওয়া যায়, যার কোন অবকাশই শরী'আতে নেই। (মিরকাত শরহে মিশকাত– ১ম খণ্ড ৪৫৬ পৃষ্ঠা)

ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, যদি কেউ এ কথা বলে যে, (দু'গজ জমিতে তৈরী) ক্ববরটির উপরে বুনিয়াদ গাড়া কিংবা ঘর তৈরী নিষিদ্ধ। কিন্তু ওর আশেপাশে মাসজিদ ও মাশ্হাদ বা সমাবেশের জায়গা করতে নিষেধ নেই। তাহলে ওর জওয়াব এই যে, কোথাও কখনো এ ব্যাপারটা দেখা কিংবা শোনা যায়নি যে, কোন ক্ববরের সম্মানে লোকেরা ঐ ক্ববরের উপরেই মাযার কিংবা মাসজিদ তৈরী করেছে। প্রকৃতপক্ষে এটা সম্ভবও নয়। তাহলে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐ নিষেধের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তিনি কখনো আজেবাজে ও অর্থহীন কথাও বলতেন– নাঊযুবিল্লাহ।

এ কথা প্রকাশ্য যে, কোন জিনিষ করা মানা কেবল সেই ব্যাপারে হয় যা করা হয় কিংবা করা যেতে পারে। যা করা সম্ভবই নয় তা মানা করার অর্থ কী? বাস্তবে দেখা যায় যে, লোকেরা ক্ববরের কাছে চারদিকে মাসজিদ ও সমাবেশস্থল নির্মাণ করে। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ কাজই মানা করেছেন। কোন বিশেষ ক্ববরের সংলগ্ন চারদিকে এক-দু'হাত উঁচু দেয়াল তোলা অথবা ক্ববরের চারদিকে এভাবে গম্বুজ, মাসজিদ ও যিয়ারতগাহ তৈরী করা যার ভেতরে ক্ববর থাকে (তা মাঝখানে হোক কিংবা কোন কোণে হোক) এটা আরবী ভাষার বাগধারা অনুসারে ক্ববরের উপরেই নির্মাণ কাজ বোঝায়। যা করতে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

আরবী বাকধারায় বলা হয়– 'বানাস্ সূলত্ব-নু 'আলা-মাদীনাতি কাযা আও ক্বরয়্যাতি কাযা সূরান' অর্থাৎ– অমুক শহরে কিংবা অমুক গ্রামে বাদশাহ্ প্রাচীর নির্মাণ করেছেন। অথচ ঐ প্রাচীরটা শহর ও গ্রামের কোন এক ধারে তৈরী করা হয়। একথাও বলা হয়– 'বানা-ফুলা-নুন ফিল্ মাকা-নিল ফুলা-নী মাসজিদান"

অর্থাৎ– অমুক ব্যক্তি অমুক জায়গায় মাসজিদ বানিয়েছে। অথচ মাসজিদটা ঐ জায়গার কোন এক অংশে হয়ে থাকে। তাই যারা একথা ভাবে যে, ক্ববরের আশেপাশে তৈরী করা মাসজিদ ও যিয়ারতগাহ– তা 'ক্ববরের উপরে নির্মাণ করা' বলে গণ্য হবে না তারা আরবী ভাষা এবং ওর প্রবাদ ও বাগধারা মোটেই জানে না।
(শারহুস সুদূর বি তাহরীমি রফয়িল কুবূর– ১৫ পৃষ্ঠা)

ইমাম আবূ হানীফার ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন, ক্ববরের কাছে মাসজিদ নির্মাণ আমাদের নিকট মাকরূহ তথা হারাম কাজ।(কিতাবুল আসার–৪৫ পৃঃ)

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রহঃ) বলেন, সমস্ত ইমামদের সর্বসম্মত রায় এই যে, কোন মৃতব্যক্তিকে মাসজিদে দাফন করা কখনই জায়িয নয়। মাসজিদ যদি ক্ববরের আগে থাকে তাহলে ক্ববরটাকে পাল্টে দিতে হবে। ক্ববর যদি নতুন হয় তাহলে লাশটাকে ওখান থেকে বের করে সাধারণ গোরস্তানে ক্ববর দিতে হবে। আর মাসজিদ যদি পরে বানানো হয় তাহলে মাসজিদটাকে নষ্ট করে দিতে হবে, নতুবা ক্ববরটার রূপ বিকৃত করে দিতে হবে। ফলকথা সেই মাসজিদ, যাতে ক্ববর আছে তাতে ফারয ও নফল কোন নামাযই বৈধ নয়। যা শরী'আতে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। (মাজমূউ ফাতাওয়া; ইবনু তাইমিয়্যাহ্– ১ম খণ্ড ১০৭পৃষ্ঠা; ২য় খণ্ড ১৯২ পৃষ্ঠা)

কিছু হাম্বলী 'আলিম বলেন, ক্ববরের কাছে বারকাত লাভের উদ্দেশ্যে সলাত পড়লে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের ঘোর বিরোধিতা করা হয় এবং এমন এক দ্বীনের আবিষ্কার করা হয় যার অনুমতি আল্লাহ কখনই দেননি। এরূপ কাজ হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। তাই ক্ববরের কাছে সলাত আদায় করলে ওকে সজদাহ্‌র জায়গা বানানো হয় এবং ওর উপরে (মাসজিদ কিংবা পাকা মাযার) নির্মাণ করা শির্কের সবচেয়ে বড় ও বুনিয়াদী কারণ হয়ে থাকে– (কাবৃরুঁ পার মাসা-জিদ কী তা'মীর– ৩৯ পৃষ্ঠা)। হাম্বলী ফিক্‌হ গ্রন্থ শারহে মুন্তাহায় আছে, ক্ববরে নির্মিত মাসজিদের মধ্যে সলাত আদায় করা বাতিল এবং এরূপ মাসজিদকে চুরমার করে দেয়া ওয়াজিব তথা অবশ্য কর্তব্য। (কাবৃরুঁ পার মাসা-জিদ কী তা'মীর– ৪৪ পৃষ্ঠা)

গোরস্থানের মাসজিদে সলাত হবে কি?

'আল্লামা ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রহঃ) বলেন, গোরস্থান কেবল ঐ জায়গাকেই বলে না যেখানে বহু ক্ববর আছে। বরং প্রত্যেক সেই জায়গাই গোরস্থান যেখানে কোন ক্ববর আছে। আমাদের উলামা সাথীগণ বলেন যে, বিভিন্ন ক্ববরের আশেপাশে যে জমি ক্ববরস্থানের অন্তর্ভুক্ত তাতেও সলাত আদায় বৈধ নয়। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, কোন গোরস্থানে একটি ক্ববর থাকলেও তাতে সলাত আদায় বৈধ নয়। (আল-ইখ্‌তিয়ারাতুল ইলমিয়্যাহ্– ২৫ পৃষ্ঠা)

আবূ বাক্‌র আল্-আস্‌রম বলেন যে, আমি নিজে শুনেছি, ইমাম আহমাদকে

গোরস্থানে সলাত পড়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তা মাকরূহ তথা হারাম। আবার জিজ্ঞেস করা হল, বিভিন্ন ক্ববরের মাঝে যদি কোন মাসজিদ থাকে তাহলে ওর মধ্যে সলাত আদায় করাটা? তিনি বললেন, এটাও মাকরূহ তথা হারাম। আবার জিজ্ঞেস করলেন, কোন মাসজিদ ও ক্ববরের মাঝে যদি কোন জিনিষ আড়াল থাকে তাহলেও কি? তিনি বললেন, ঐ মাসজিদে ফারয সলাত মাকরূহ। তবে জানাযার সলাত আদায় করা যেতে পারে। ইমাম আহমাদ আরো বলেন, গোরস্থানে অবস্থিত মাসজিদের মধ্যে কোন সলাতই পড়া বৈধ নয়। কেবল জানাযার সলাত পড়া যেতে পারে। কারণ ঐ সলাত ক্ববরস্থানে পড়া সুন্নাত। যেমন ফাতহুল বারীতে আছে, মাদীনার বিখ্যাত গোরস্থান জান্নাতুল বাকীর মাঝখানে নাবীজির দুই স্ত্রী 'আয়িশাহ্ ও উম্মু সালামা (রাযিঃ)'র জানাযার সলাত বিখ্যাত সহাবী আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) আদায় করেছিলেন। (কাবরূঁ পার মাসাজিদ কী তা'মীর- ১৩১-১৩২ পৃষ্ঠা)

মাওলানা রশীদ আহমাদ গাংগোহী হানাফী (রহঃ) বলেন, কোন ক্ববর যদি কোন মাসজিদের ক্বিবলার দিকে থাকে তাহলে ওতে ঠাকুরপূজার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। ক্ববরটি ক্বিবলার দিকে থাকাটা সলাতের জায়গার ডানে ও বামে থাকার চেয়ে অধিকতর আপত্তিকর। আর ক্ববরটি যদি সলাতের জায়গার পিছনের দিকে থাকে তাহলে ঐ আপত্তিটা তুলনামূলক কম হবে। তথাপি এটাও আপত্তিমুক্ত নয়।

(আল-কাওয়াকিবুদ দিরারী আলা-জামিয়িত তিরমিযী- ১৫৩ পৃষ্ঠা)

কিছু 'আলিমের মতে যে কোন ক্ববরের কাছে সলাত আদায় বৈধ নয়। চায় ঐ ক্ববর কোন মাসজিদের মুসল্লার ক্বিবলার দিকে হোক, কিংবা অন্য কোন দিকে হোক। হাম্বলীদের মাযহাব তাই। হানাফী ফিক্হ গ্রন্থ হা-শিয়াতুত্ তাহ্তাভী আলা-মারা কিল ফালাহ্- ২০৮ পৃষ্ঠায়ও এরূপ লিখা আছে।

(কাবরূঁ পার মাসজিদ কী তা'মীর- ১৩৫ পৃষ্ঠা)

ইসলামী সমাবেশ ও মনগড়া সমাবেশ

ইসলামী মতে বছরের পাঁচটি নির্দিষ্ট দিনে পাঁচটি নির্দিষ্ট জায়গায় সমাবেশ হবে তা হলো-

(১) চান্দ্রবর্ষের যুলহিজ্জাহ মাসের ৮ তারিখের সূর্য ওঠা থেকে ৯ তারিখের সূর্যোদয় পর্যন্ত মাক্কাহ শরীফের মিনাতে হাজ্ব পালনকারীদের সমাবেশ।
(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- ২২৪ পৃষ্ঠা)

(২) ঐ মাসের ৯ তারিখের সূর্যোদয়ের পর থেকে ঐদিনের সূর্যাস্ত পর্যন্ত মিনা থেকে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত আরাফাতের ময়দানে হাজ্বব্রত পালনকারীদের সমাবেশ। (ঐ মিশকাত- ২২৮ পৃষ্ঠা)

(৩) ঐ দিনের সূর্যাস্তের পর থেকে ১০ তারিখের সূর্য ওঠার আগে পর্যন্ত

আরাফাত থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত মুযদালিফায় ঐসব হাজ্বীদের সমাবেশ। (মুসলিম, মিশকাত– ২২৫ পৃষ্ঠা)

(৪) ঐ দিনের সূর্যোদয়ের পর থেকে মাথার উপর হতে পশ্চিমে সূর্য ঢলার আগে পর্যন্ত মুযদালিফা থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত মিনায় বড় শাইত্বনকে কাঁকর মারার সমাবেশ।(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত– ২৩১ পৃষ্ঠা)

অতঃপর ঐদিনের কুরবানী সেরে মিনা থেকে চার মাইল দূরে অবস্থিত কা'বা শরীফে তওয়াফ করার সমাবেশ– (মুসলিম– ১ম খণ্ড ৪০০ পৃষ্ঠা)। তওয়াফের পরই সাফা ও মারওয়ার মাঝে ওঁদেরই ছুটাছুটির সমাবেশ।

(৫) তারপর ১১, ১২ ও ১৩ যুলহিজ্জায় আবার মিনায় কাঁকর মারা ও আল্লাহর বিভিন্ন যিক্‌র করার জন্য ওঁদের সমাবেশ। (মুসলিম– ১ম খণ্ড ২০ পৃষ্ঠা)

উপরে বর্ণিত বছরের নির্দিষ্ট উক্ত পাঁচ বা ছয় দিনে এবং উক্ত নির্দিষ্ট স্থানে সমবেতভাবে আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য সমাবেশগুলো প্রকৃত ইসলামী সমাবেশ। এ ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্‌ (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা মাসজিদুল হারাম ও মিনা এবং মুযদালিফাহ্‌ ও আরাফাত জায়গাগুলোকে লোকদের জন্য পুণ্যের জায়গা ও সমাবেশস্থল বানিয়ে দিয়েছেন। যাতে লোকেরা ওখানে সমবেত হয়ে আল্লাহর যিক্‌র ও দু'আ এবং হাজ্ব ও কুরবানীর ইবাদাতগুলো করতে পারে। মুশরিকদেরও এরূপ কিছু বিশেষ জায়গা ছিল। যেখানে তারা সমবেত হত।অতঃপর ইসলাম যখন আসে তখন ওগুলোকে আল্লাহ্‌ নিশ্চিহ্ন করে দেন। ঠিক এরূপ (মুশরিকী) সমাবেশস্থলের মধ্যে গণ্য হয় নাবী ও সাধু পুরুষদের ক্ববরগুলো। (ইক্বতিযা-উস সিরাতিল মুস্তাকীম– ১৫৬ পৃষ্ঠা)

এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসে হিন্দ আল্লামা শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) বলেন, অগ্নিপূজক ও হিন্দুদের একটা রীতি এই যে, তারা একটি দিন নির্দিষ্ট করে (কোন মাঠে বা জায়গায়) সমবেত হয়ে উৎসব মানায়। ঠিক তেমনি পীরপূজারীগণও ওদেরই পদাংক অনুসরণে কোন না কোন (সত্য বা কাল্পনিক) বুযুর্গ ব্যক্তির মাযারে উরস মানায় এবং ওদের মত রং তামাশা ও বিলাসিতা করে তারা শাইত্বনকে তুষ্ট এবং বুযুর্গদেরকে অসন্তুষ্ট করে। (আল-বালাগুল মুবীন, ফারসী– ৩১ পৃষ্ঠা)

শাহ সাহেব অন্য জায়গায় বলেন, সবচেয়ে জঘন্যতম বিদ'আতের মধ্যে একটি এই যে, লোকেরা ক্ববরগুলোর ব্যাপারে যা সৃষ্টি করেছে তা হল ঐগুলোকে উৎসবস্থল বানানো। (তাফহীমাতে ইলাহিয়্যাহ্‌– ২য় খণ্ড ৬৪ পৃষ্ঠা)

উপরের আলোচনাগুলো পরিষ্কার প্রমাণ করে যে, বছরের কোন একটি নির্দিষ্ট দিনে কোন মাযারে উরসের সমাবেশ করা মনগড়া সমাবেশ এবং তা কা'বা ও মিনা, আরাফাত ও মুযদালিফার সমাবেশের সাথে সাদৃশ্য হওয়ার কারণে পরোক্ষভাবে জঘন্যতম বিদ'আতী সমাবেশ। আল্লাহ ঐরূপ সমাবেশকারীদের সুমতি দিন– আমীন!

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্বরের বিবরণ

মাযারভক্ত ভাইয়েরা মাযার পাকা করার ব্যাপারে ইসলাম ধর্মের মূল উৎস কুরআন এবং হাদীস থেকে কোন দলীল পেশ করতে পারেন না বলে তাঁরা নাবীজীর ক্বর পাকা কেন– তার দোহাই দেন এবং ঐ দোহাইয়ের ভিত্তিতে তাঁরা নিজেদের ভক্তির পাত্রের ক্বর পাকা করেন। তাই এখন আমাদের জানা দরকার যে, নাবীজীর ক্বর পাকা কবে হল ও কেন হল? এবং ঐ সময়কার 'আলিমগণ নাবীজীর ক্বর পাকা সম্বন্ধে তখন কী মন্তব্য করেছিলেন?

খালীফা আবূ বাক্র (রাযিঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক নাবীই যেখানে মৃত্যুবরণ করেছেন সেখানেই তাঁর লাশ দাফন করা হয়েছে।

(মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক– ৩য় খণ্ড ৫১৬ পৃষ্ঠা)

যেহেতু রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদীনার মাসজিদে নাবাবীর সংলগ্ন তাঁর স্ত্রী 'আয়িশাহ (রাযিঃ)-এর হুজরায় মারা যাওয়ায় তাঁকে ঐ ঘরেই সমাধিস্থ করা হয়। নাবীজীর ক্বর ঘরে হবার রহস্য সম্পর্কে মা 'আয়িশাহ্ বলেন, যে রোগ থেকে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর উঠতে পারেননি সেই সময় তিনি বলেন, আল্লাহর অভিসম্পাত হোক ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের উপর যারা তাদের নাবীদের ক্বরগুলো সজদাহ্র জায়গা বানিয়ে নিয়েছে।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- ৬৯ পৃষ্ঠা)

অতঃপর 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন, (নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্বরটি সজদাহ্র জায়গা হবার) ঐ ভয় যদি না থাকত তাহলে তাঁর ক্বরটা খোলা জায়গায় হত। (মুসলিম– ১ম খণ্ড ২০১ পৃষ্ঠা)

তাই নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মাতদের সতর্ক করে একদিন বলেন, সাবধান! তোমাদের আগে যারা ছিল তারা তাদের নাবী এবং সাধুপুরুষদের ক্বরগুলোকে সজদাহ্র জায়গা বানিয়ে নিত। খবরদার! তোমরা ক্বরগুলোকে সজদাহ্র জায়গা বানিও না। আমি তোমাদেরকে ঐ ব্যাপারে নিষেধ করছি। (ঐ, পৃষ্ঠা– ঐ, মিশকাত– ৬৯ পৃষ্ঠা)

শুধু ক্বর পাকা ও সজদাহ্র জায়গা বানানোর নিষেধাজ্ঞা নয়, বরং তার চেয়েও বেশী অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, তোমরা আমার ক্বরকে মেলাতে প্ররিণত করো না। (আবূ দাউদ– ১ম খণ্ড ২৭৯ পৃষ্ঠা; কিতাবুল মানাসিক, বাবু যিয়ারাতিল কুবূর)

ভিড় করার ব্যাখ্যায় সুহাইল ইবনু আবূ সুহাইল নামক এক মহাবিদ্বান বলেন, একদা আমি নাবীজীর ক্বরে সালাম দিতে গেলাম। তখন আমাকে নাবীজীর নাতি হাসানের পুত্র যয়নুল আবেদীন দেখতে পেয়ে বললেন, তোমার কী হল যে,

তোমাকে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ববরের নিকট দাঁড়ানো দেখছি? তিনি বললেন, আমি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সালাম দেব বলে দাঁড়িয়ে আছি। তিনি বললেন, তুমি যখন নাবীজীর মাসজিদে ঢুকবে তখনই সালাম দাও এবং বল– 'আস্‌সালামু 'আলা-রসূলিল্লাহ'। তারপর তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আমার ক্ববরকে মেলায় পরিণত করো না। (সুনানে সায়ীদ ইবনু মানসুর, কিতাবুর রদ্দে আলাল ইখনায়ী– ৯৩ পৃষ্ঠা)

উক্ত হাদীস ও ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ববরে উরস তো হবেই না এবং তাঁর ক্ববরে গিয়ে সালাম দেবার সময় দাঁড়ানোও চলবে না। কাযী ইয়ায মাব্‌সূত থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নাবীজীর ক্ববর যিয়ারতকারী ব্যক্তি তাঁর ক্ববরের নিকট দাঁড়াবে না এবং দু'আও করবে না বরং তিনি সালাম দেবেন এবং চলে যাবেন। (মুশাহাদাতুল মা'সূমিয়্যাহ– ১৫ পৃষ্ঠা)

দূরদর্শী নাবীজী তাঁর উম্মাতকে মাযারপূজা থেকে বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও তিনি আবার নিজ প্রতিপালককেও কাকুতি-মিনতিসহকারে বলেন, হে আল্লাহ! আমার ক্ববরকে তুমি ঠাকুর বানিও না, যার পূজা করা হয়।(মুয়াত্তা ইমাম মালিক; মিশকাত– ৭২)

এ কারণেই ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রহঃ) বলেন, খুলাফায়ি রাশিদীনের যুগে সমস্ত সহাবায়ি কিরাম নাবীজীর মাসজিদে ঢুকতেন এবং পাঁচওয়াক্ত সলাত আদায় করতেন। আর নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ পাঠ করতেন এবং মাসজিদে প্রবেশের সময় তাঁর উপর সালাম দিতেন। কিন্তু তাঁরা ক্ববরওয়ালা হুজরাটির একধারে গিয়ে দাঁড়াতেন না। খুলাফায়ি রাশিদীন এবং সহাবীদের সময়ে তাঁর (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হুজরাটি মাসজিদের বাইরে ছিল। তাই তাঁদের এবং ঐ ক্ববরের মাঝে দেয়ালের আড়াল ছিল।

(কিতাবুর রদ্দি 'আলাল ইখনায়ী– ১১৭-১১৮ পৃষ্ঠা)

ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর পর থেকে লোকেরা নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবিগণের ঘরে ঢুকে জুমু'আর সলাত আদায় করতেন। অতঃপর মাসজিদে জায়গার অকুলান হয়। সে সময় ঐ হুজরাগুলো মাসজিদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

(আফউল অফা– ১ম খণ্ড ৩৬৬ পৃষ্ঠা; কিতাবুর রদ্দি 'আলাল ইখ্‌নায়ী– ১১৮ পৃষ্ঠা)

এভাবে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তিরোধানের পর ৭৭ বছর কেটে যায়। অতঃপর তদানীন্তন মুসলিম জাহানের খলীফা ওয়ালীদ ইবনু 'আব্‌দুল মালিক গভর্ণর 'উমার ইবনু 'আব্‌দুল 'আযীযকে ৮৮ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে এক পত্র লিখে জানান যে, আপনি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদের ঘরগুলো মাসজিদে নাবাবীর পিছনে ও আশপাশ থেকে কিছু জায়গা কিনে চতুর্দিকে দুশো হাত করে মাসজিদটা বাড়িয়ে দিন।

(তারীকুল উমাম অলমুলূক ওরফে তাবারী– ৫ম খণ্ড ২২২ পৃঃ; আলকামিল– ৩য় খণ্ড ১০৯ পৃঃ)

অন্য বর্ণনায় আছে যে, ওর আগের মাস সফর মাসে খলীফা অলীদ রোমক সম্রাটকে জানান যে, তিনি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাসজিদ টিকে ভাঙ্গার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই আপনি আমাকে ঐ ব্যাপারে সাহায্য করুন। ফলে তিনি এক লক্ষ মিসকাল সোনা এবং একশো মিস্ত্রী আর চল্লিশ বোঝা রং বেরংয়ের পাথর কুচি খলীফার নিকট পাঠান এবং দেশের বিভিন্ন শহরে পড়ে থাকা আরো পাথরকুচি খোঁজার নির্দেশ দেন। খলীফা অলীদ ঐসব সরঞ্জাম গভর্ণর 'উমারের নিকট চালান দেন। (প্রথমোক্ত- ২২৩ পৃষ্ঠা; শেষোক্ত- ১০৯ পৃষ্ঠা)

মাসজিদে নাবাবীর বিস্তৃতি

খলীফা অলীদের পত্র পেয়ে গভর্ণর 'উমার মাদীনার দশজন বিখ্যাত ফকীহ এবং বিশিষ্ট নাগরিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের জড় করে পত্রটি পড়ে শোনালেন। তাঁরা খুবই দুঃখিত হলেন এবং বললেন, এই হুজরাগুলো খুবই ছোট। এর ছাদগুলো খেজুর পাতার এবং দেওয়ালগুলো ইঁটের। আর ওর দরজায় ঝুলছে চাটাই। এগুলোকে ঐ অবস্থায় ছেড়ে দেয়াই উত্তম। যাতে হাজ্ব যাত্রী এবং মাযার যিয়ারতকারী ও ভ্রমণবিলাসীরা ঐ অবস্থাবলী এবং নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুজরাগুলো দেখে শিক্ষা গ্রহণ করবে। এসব বক্তব্য গভর্ণর 'উমার খলীফার নিকট পত্র মারফত জানালেন। উত্তরে খালীফা লিখলেন, পূর্ব নির্দেশ মোতাবেকই মাসজিদটি তৈরী করুন। ফলে গভর্ণর 'উমার কোন উপায় না পেয়ে মাসজিদটি ভাঙ্গাভাঙ্গির নির্দেশ দিলেন। অতঃপর ভাঙ্গাভাঙ্গি যখন শুরু হল তখন মাদীনার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং হাশিম গোত্রের মুখ্য ব্যক্তিবৃন্দ চিৎকার দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। তাঁরা ঐভাবে কাঁদলেন যেমন তাঁরা নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যু দিবসে কেঁদেছিলেন। (আলবিদায়াহ্ অননিহায়াহ্- ৯ম খণ্ড ৭৪ পৃষ্ঠা)

অতঃপর উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্‌র হুজরার পূর্ব দিকের দেওয়ালটা যখন খোঁড়া হচ্ছিল তখন একটি পা বেরিয়ে পড়ল। সবাই ভয় পেলেন যে, মনে হয় এটা নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পা হবে। কিন্তু তদন্ত করে জানা গেল যে, ওটা ছিল 'উমার (রাযিঃ)-এর পা। ঐ সময় একথাও বর্ণিত আছে যে, তাবিঈ নেতা সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়িব 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-এর হুজরাকে মাসজিদে নাবাবীর অন্তর্ভুক্ত করতে আপত্তি করেন। এই ভয়ে যে, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ববর যেন সজদার জায়গায় পরিণত না হয়। (ঐ- ৭৫ পৃষ্ঠা)

এভাবে মাসজিদে নাবাবীর বিস্তৃতির কাজ শুরু হল। অতঃপর একদিন নিরালা দেখে মাসজিদের নির্মাণ কাজ চলাকালীন একজন খ্রীস্টান মিস্ত্রী অন্য রোমককে বলে, আমি ওদের নাবীর ক্ববরে প্রস্রাব করব না কি? তারপর সে ওর জন্য প্রস্তুত হয়। তার সাথীরা তাকে ঐ কাজ করতে নিষেধ করে। তথাপি সে উদ্যত হলে

আছাড় খায় এবং মাথা ঠুকে পড়ে যায়। অতঃপর তার মগজ গড়িয়ে পড়ে। তা দেখে কিছু খ্রীস্টান কারিগর মুসলমান হয়ে যায়। আর এক খ্রীস্টান মিস্ত্রী মাসজিদের বারান্দায় ক্বিবলার দিককার দেয়ালে পাঁচটি তাকের উপরে শূকরের ছবি এঁকে দেয়। অতঃপর খলীফা 'উমার ইবনু 'আব্‌দুল 'আযীয তা জানতে পারেন। তাই তাঁর নির্দেশে ঐ মিস্ত্রীর গর্দান উড়িয়ে দেয়া হয়। (অফাউল অফা– ১ম খণ্ড ৩৬৮ পৃষ্ঠা)

এই মাসজিদ নির্মাণ করতে চল্লিশ হাজার মতান্তরে পঁয়তাল্লিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা খরচ হয়। (ঐ– ৩৭১ পৃষ্ঠা)

৮৮ হিজরীতে এই মাসজিদের নির্মাণ কাজ 'উমার ইবনু 'আব্‌দুল 'আযীয শুরু করেন এবং সুদীর্ঘ তিন বছর পর ৯১ হিজরীতে তা শেষ করেন। ঐ বছরেই খলীফা হাজ্জে যান। হাজ্জের পর তিনি মাসজিদে নাবাবী দেখতে যান। অতঃপর মাসজিদে প্রবেশ করে চারদিকে ঘুরে ঘুরে তিনি দেখতে লাগলেন এবং 'উমারকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকেন, এদিকে এসো, এদিকে এসো। সেই সময় তাঁর সাথে 'উসমান গনীর পুত্র আবান ছিলেন। মাসজিদটি পরিদর্শনের পর খলীফা অলীদ আবানকে বললেন, তোমাদের নির্মাণ থেকে আমাদের নির্মাণটি কেমন হল? আবান বললেন, আমরা এটাকে মাসজিদ বানিয়েছিলাম। আর আপনারা এটাকে গির্জা বানিয়েছেন। (ঐ– ৩৭১ পৃষ্ঠা; কিতাবুর রদ্দি 'আলাল ইখ্‌নায়ী– ১১৯ পৃষ্ঠা)

সবশেষে খলীফা অলীদ মাসজিদে নাবাবীতে একটি বক্তৃতা করেন এবং তারপর কা'বা শরীফের একটি মোটা রেশমী গিলাফ মাসজিদে নাবাবীতে পরিয়ে দেন। (আল-বিদায়াহ্– ৯ম খণ্ড ৮৭ পৃষ্ঠা)

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, অলীদের আগে মাসজিদে নাবাবী দু'বার বাড়ান হয়েছিল। প্রথমবারে দ্বিতীয় খলীফা 'উমার ইবনুল খাত্তাবের খিলাফাত কালে দশ গজ বাড়ান হয়েছিল। তখন তিনি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবিগণের ঘরগুলো মাসজিদের মধ্যে শামিল করেননি (ঐ– ৩৫০ পৃষ্ঠা)। ঐ সময় তিনি মাদীনার কুরাইশ এবং আনসার ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে ডেকে বলেন, তোমরা তোমাদের ক্বিবলার বুনিয়াদের কাছে হাযির থাক। তোমরা এ কথা বল না যে, 'উমার আমাদের ক্বিবলা বদলে দিয়েছেন। তাই তখন ঐ জায়গা থেকে একটি করে পাথর সরাবার সাথেই একটি নতুন পাথর রাখা হতে লাগল।

(কিতাবুর রদ্দি 'আলাল ইখ্‌নায়ী– ১২০ পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয়বারে তৃতীয় খলীফা 'উসমানের যুগে তাঁর শাহাদাতের চার বছর আগে মাসজিদটি আবার বাড়ানো হয়। ঐ সময় তিনি 'আব্বাস ইবনু 'আব্‌দুল মুত্তালিবের ঘর এবং হাফসাহ্ বিনতু 'উমারের ঘরের কিয়দাংশ মাসজিদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। তিনি কিবলা এবং সিরিয়া ও পশ্চিম দিকে পঞ্চাশ গজ বাড়ান। তিনি নকশা করা পাথর দ্বারা তা বাড়ান এবং সিমেন্ট দ্বারা তা সদাক্বাহ্ করে দেন। কিন্তু তিনি

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ববরকে মাসজিদের অন্তর্ভুক্ত করেননি। এভাবেই মাসজিদটি থাকে। পরিশেষে খলীফা অলীদ মাসজিদটিকে আরো বাড়ান এবং রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবিদের হুজরাগুলো মাসজিদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন।(কিতাবুর রদ্দি 'আলাল ইখ্নায়ী– ১২৩ পৃষ্ঠা)

ফল কথা মহানাবীর ক্ববরটি বহু সহাবী ও তাবিঈর বাধা এবং বুক ভাসানো চোখের পানির মধ্যে দিয়ে তাবিঈ আবান ইবনু 'উসমানের ভাষায় গির্জারূপী মাসজিদে নাবাবীর মধ্যে ঢুকে পড়ল। এই অবস্থায় ৪৬৯ বছর কাটল। অর্থাৎ মাসজিদের এক কোণে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ববর থাকলো। কিন্তু তার আশপাশটা বিশেষভাবে ঘিরে পাকা করা হোল না এবং তার উপরে কোন গম্বুজও তৈরী হল না। অতঃপর ৫৫৭ হিজরীতে নাবীজীর লাশ চুরির গোপন ষড়যন্ত্র হল। ফলে তাঁর ক্ববরটির চারপাশে সিসা ঢেলে দেয়া হল। ঘটনাটি এরূপ ঃ

নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ববর পাকা করার কারণ

হিজরীয় ষষ্ঠ শতকে মিসরে এক তাহাজ্জুদগুযার দ্বীনদার ও পরহেযগার বাদশাহ ছিলেন আলআদিল নুরুদ্দীন শহীদ রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি। ৫৫৭ হিজরীতে এক রাতে তাহাজ্জুদ পড়ার পর তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্বপ্ন দেখেন যে, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে লাল-হলুদ বর্ণের দু'জন লোকের প্রতি ঈশারা করে বলছেন, এদের দু'জনের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার কর। ফলে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায় ঘাবড়ানো অবস্থায়। তারপর তিনি উযূ করলেন এবং সলাত আদায় করে শুয়ে পড়লেন। অতঃপর তিনি হুবহু ঐ স্বপ্নই দেখলেন এবং জেগে উঠলেন। আবার তিনি সলাত আদায় করলেন এবং শুয়ে গেলেন। তারপও তৃতীয়বার তিনি ঐ স্বপ্নই দেখলেন এবং জেগে উঠলেন। এরপর আর তাঁর ঘুম এলো না।

তাঁর এক মন্ত্রীও ছিলেন আল্লাহ ভীরু। যাঁর নাম ছিল জামালুদ্দীন মুসিলী। তাই তিনি মন্ত্রীকে ঐ রাতেই ডেকে পাঠালেন এবং তাঁকে স-বিস্তারিত ঘটনাটি শুনালেন। এবার মন্ত্রী বললেন, তাহলে আপনি এখনো বসে কেন? এখনই চলুন মাদীনাহ শরীফ। আর আপনি যা দেখেছেন তা গোপন রাখুন।

তারপর বাদশাহ বহু মালধনসহ তাঁর উযীর এবং বিশজন আরোহীকে সঙ্গে নিয়ে মাদীনার দিকে পাড়ি দিলেন। অতঃপর ষোল দিনে তাঁরা মাদীনায় পৌঁছে গেলেন। তারপর বাদশাহ গোসল করলেন এবং মাসজিদে নাবাবীতে ঢুকে সলাত আদায় করলেন। যাতে ঐ লোক দু'টিকে ধরা যায়। বাদশার ঘোষণা শুনে বহু লোক এল এবং বাদশার হাত থেকে গরীবরা দান এবং ধনীরা হাদিয়া নিয়ে গেল। পরিশেষে যখন লোক আসা বন্ধ হল তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আর কেউ বাকী

আছে কি? লোকেরা বলল, দু'জন পশ্চিমী ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ বাকী নেই। কিন্তু ওরা তো কারো কাছ থেকে কিছু নেয় না এবং ওরা খুবই সাধুপুরুষ ও ধনী। যারা নিজেরাই দান করে বিভিন্ন প্রয়োজনে। কথাগুলো শুনে বাদশাহর মন খুশি হল। তাই তিনি বললেন, ঐ দু'জনকে আমার নিকটে আন। ফলে ওদেরকে আনা হল। বাদশাহ দেখলেন যে, এরাই সেই দু'জন যাদের প্রতি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত করেছিলেন– এই বলে যে, এদের দু'জন থেকে আমাকে উদ্ধার কর।

তাই বাদশাহ বললেন, তোমরা কোথাকার লোক? তারা বলল, পশ্চিম দেশের। আমরা হাজ্ব করতে এসেছিলাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পড়শী হওয়া পসন্দ করলাম। এবার বাদশাহ বললেন, আপনারা সত্য কথা বলুন। তবুও তারা আগের কথায় অটল থাকল। তারপর বাদশাহ বললেন, আপনাদের থাকার জায়গা কোথায়? তারা বলল, নাবীজীর ক্ববরের নিকটবর্তী সীমান্তে। অতঃপর বাদশাহ তাদেরকে একটি ঘরে আটক রেখে নিজে তাদের থাকার জায়গায় উপস্থিত হলেন। সেখানে তিনি অনেক মালধন ও সীলমোহর এবং হৃদয় গলানোর কিছু গ্রন্থ দেখতে পেলেন। এছাড়া আর কিছু দেখা পেলেন না। তদুপরি মাদীনার বাসিন্দারা তাদের দু'জনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বললেন, এঁরা দু'জন আজীবন রোযাদার এবং নাবীজির রওযার মধ্যে সলাতের খুবই পাবন্দ। আর এঁরা প্রত্যেক দিন সকালে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এবং জান্নাতুল বাকীর ক্ববর যিয়ারত করেন এবং প্রত্যেক শনিবারে কুবায় যিয়ারত করেন। এঁরা কোন যাঞ্চাকারীকে কখনই ফেরায় না। এই বছর দুর্ভিক্ষের সময় এঁরা মাদীনাবাসীদের অভাব মোচন করেছেন।

তারপর বাদশাহ তাদের ঘরটা অনুসন্ধান করতে লাগলেন এবং একটি চাটাই তুললেন। অতঃপর নাবীজীর ক্ববর মুবারকের দিকে ধাবিত একটি সুড়ঙ্গ দেখতে পেলেন। ফলে সমস্ত লোকই কেঁপে উঠল। তারপর বাদশাহ বললেন, এখনো তোমরা তোমাদের সত্য কথাটা বল? অতঃপর তাদেরকে প্রহর করা হলো এবং প্রহরের প্রচণ্ডতায় স্বীকার করতে বাধ্য হলো যে, তারা মূলতঃ খ্রীস্টান। তারা নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লাশ উধাও করতে ও সরাতে এসেছে। রাতে তারা মাটি খুঁড়ত। পশ্চিমবাসীদের মত তারা চামড়ার জুব্বা পরত। ঐ জুব্বার মধ্যে তারা মাটিগুলো নিয়ে জান্নাতুল বাকী যিয়ারত করার ভান করে বিভিন্ন ক্ববরে তা ছড়িয়ে দিত। অতঃপর তারা যখন নাবীজীর হুজরার নিকটবর্তী পৌঁছে যায় তখন আকাশ গর্জন করে এবং বিদ্যুৎ চমকে ওঠে। আর একটা বিরাট কম্পন হয় যদ্দ্বারা মনে হয় যে, ওখানকার পাহাড়গুলো যেন উৎপাটিত হল। ঐ দিন ভোরেই বাদশাহ মাদীনায় পৌঁছেন এবং তাদেরকে ধরে ফেলেন। কোন উপায় না দেখে তারা খুবই কাঁদতে থাকে। অতঃপর বাদশাহর নির্দেশে তাদের মুণ্ডুপাত করা হয়। ঐ দু'জন ছিল স্পেনের বাসিন্দা।

তারপর বাদশাহ প্রচুর সিসা আনালেন এবং নাবীজীর হুজরার চারিদিকে পাতালের পানি পর্যন্ত গভীর গর্ত খোঁড়ালেন। অতঃপর সিসাগুলো গলিয়ে ঐ গর্তগুলোতে ভরে দিলেন। ফলে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুজরার চতুর্দিকে সীসার দেয়ালে পরিণত হল। (আফাউল-অফা– ১ম খণ্ড ৪৬৬-৪৬৮ পৃষ্ঠা; আদ্দুররুস্ সানিয়্যাহ্ ফিল আজভিবাতিন নাজ্দিয়্যাহ্– ২য় খণ্ড ৪০৯ পৃষ্ঠা)

এভাবে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং পরিস্থিতির তাকিদে প্রিয় নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পুরো ক্বরটা নয়, কেবল ওর চতুষ্পার্শ্বটা অগত্যায় পাকা করতে হয়।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ববরে সবুজ গম্বুজ

'আল্লামা সামহুদী বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অফাতের পর থেকে প্রায় (৭০০) সাতশো বছর ধরে তাঁর ক্ববরে কোন পাকা ইমারত ছিল না। তারপর ৬৭৮ হিজরীতে (মিসরের বাদশাহ) মানসূর ইবনু কাল্লাদুন সলিহী কামাল আহমাদ ইবনু বুরহান 'আব্দুল কাভীর পরামর্শে কাঠের একটি গম্বুজের মত তৈরী করেন এবং সেটাকে 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) এর হুজরার ছাদের উপর লাগিয়ে দেন। ওটাই কুব্বায়ে যুর্রক্ব বা সবুজ গম্বুজ নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। সে যুগের 'আলিমগণ কোনভাবেই ঐ কাজ করা থেকে বাদশাহকে বাধা দিতে পারেননি। তবে তাঁরা ওটাকে খুবই জঘন্য কাজ ভাবেন। অতঃপর ঐ কাজের পরামর্শদাতা পূর্বোক্ত কামাল আহমাদ যখন গদিচ্যুত হন তখন লোকেরা তার ঐ গদিচ্যুতিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার উক্ত জঘন্য কাজের শাস্তি হিসেবে গণ্য করেন। তারপর আল-মালিকুন না-সির হাসান মুহাম্মাদ কাল্লাদুন এবং তাঁর পরে ৭৬৫ হিজরীতে 'আলমালিকুল আশরাফ শা'বান ইবনু হুসাইন ইবনু মুহাম্মাদ ওতে সংযোগজনীয় নির্মাণকার্য করেন। এভাবে বর্তমান নির্মাণ পর্যন্ত কাজ চলতে থাকে।

(অফাউল অফা– ৪৩৫-৪৩৬ পৃষ্ঠা)

তারপর নাবীজির ক্ববরটাকে নয়নাভিরাম লোহার জাল দিয়ে ঘিরে দেয়া হয়েছে এবং সেখানে পুলিশও মোতায়ন করা হয়েছে। যাতে শরী'আত বিরোধী কোন কাজই তারা সেখানে কাউকেই করতে না দেন।

'আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ববরে পুলিশ মোতায়েন করা এবং শরী'আত বিরোধী কাজ হতে না দেয়ার জন্য বর্তমান সউদী সরকার কৃতজ্ঞতার অধিকারী। কিন্তু এতটা কাজই যথেষ্ট নয়, বরং ঐ সরকারের অপরিহার্য কর্তব্য হল রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাসজিদকে ওর আগেকার অবস্থায় ফিরিয়ে আনা। অর্থাৎ মাসজিদে নাবাবী এবং ক্ববরে নাবাবীর মাঝে উত্তর ও দক্ষিণে একটা লম্বা দেয়াল তুলে দেয়া। যা ক্ববরে নাবাবীকে মাসজিদ থেকে আলাদা করে দেবে। যাতে করে মাসজিদে নাবাবীতে প্রবেশকারীগণ ওর মধ্যে শরী'আত বিরোধী এমন

কিছু দেখতে না পান যা নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অপসন্দ ছিল। তা হল এই যে, কোন মাসজিদের মধ্যে কোন ক্বর যেন না থাকে। এরূপ কাজের কার্যীকে তিনি লা'নাত ও অভিসম্পাত দিয়েছেন। সাউদী হুকুমাত যদি সত্যিকারভাবে তাওহীদ তথা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার সংকল্প রাখেন তাহলে তাঁদের এই প্রস্তাব মোতাবেক কাজ করা একান্ত কর্তব্য। আমি আশা করি যে, আল্লাহ তা'আলা সাউদী হুকুমাত দ্বারা এই কাজটা করিয়ে দেবেন। সাউদী হুকুমাতের চেয়ে এই কাজের বেশী দায়িত্বশীল ও যোগ্য আর কে হতে পারে?

(ক্বাবরুঁ পর মাসজিদ কী তা'মীর– ৬৮ পৃষ্ঠা)

উপরোক্ত বর্ণনাগুলো প্রমাণ করে যে, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহর ক্বর সম্বলিত হুজরাটি চারদিক দিয়ে ঘিরে দেয়া হয়েছিল। যার ছাদটা ক্বরে নাবাবীর আগেই উপস্থিত ছিল। তারপর এক বিদ'আতী বাদশাহর বিদ'আতী ধ্যানধারণার ভিত্তিতে ওর ছাদের উপরে গম্বুজ তৈরী করা হয়েছিল। যা স্বয়ং রসূলুল্লাহর পূর্বে বর্ণিত হাদীস অনুসারে মনগড়া তথা ইসলাম বিরোধী কাজ ছিল। তাই রসূলুল্লাহর ক্বর অগত্যায় পাকা করার দোহাই দিয়ে যে কোন ক্বরকে পাকা মাযারে পরিণত করা যাবে কি? যেমন বর্তমানে হচ্ছে। আল্লাহ ঐরূপ ফাতাওয়াদাতাদেরকে সুমতি দিন– আমীন!

ইমাম শাফিঈর পাকা মাযার ভাঙ্গার ফাতাওয়া

তুরস্কের বিখ্যাত হানাফী 'আলিম 'আল্লামা আলুসী তাঁর গ্রন্থ 'শারহুল মিনহাজি' হাফিয হাইতামীর বরাত দিয়ে লিখেছেন যে, 'আমাদের একটি দল এই ফাতাওয়াহ দিয়েছিলেন যে, মিশরের ক্বারাফাহ্তে ক্বরগুলোর উপর যেসব ইমারত রয়েছে সে সবগুলোকেই যেন ভেঙ্গে চুরমার করে দেযা হয়। এমনকি ইমাম শাফিঈর মাযারও যেন ভেঙ্গে ফেলা হয়। যেটাকে কোন বাদশাহ ভক্তির আতিশয্যে পাকা করেছিলেন। তেমনি প্রত্যেক মুসলমানেরই উচিত যে, দাঙ্গাহাঙ্গামার আশঙ্কা না থাকলে ঐরূপ প্রত্যেক ইমারতকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়া। আর দাঙ্গাফ্যাসাদের ভয় থাকলে যুগের ইমাম ও বাদশাহর উপরে দায়িত্ব থাকবে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেয়া। এই বক্তব্যগুলো ইবনুর রিফ্আহ-এর কিতাবুস্ব সুলহি থেকে সংকলিত। (কাবরুঁ পর মাসাজিদ কী তা'মীর– ৫৩ পৃষ্ঠা)

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্বর যিয়ারত-সংক্রান্ত কতিপয় জাল-হাদীস

তিনজন বিখ্যাত হানাফী 'আলিম– দেওবন্দের মুফতী মাওলানা মুহাম্মাদ শফী এবং কলকাতা ও ঢাকার মুফতী মাওলানা আমীমুল ইহসান এবং নদওয়ার সাবেক ওস্তাদ মাওলানা মুহাম্মাদ রাবে নদভী এই হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন, যে ব্যক্তি আমার

ক্ববর যিয়ারত করলো তার জন্য আমার শাফা'আত অবধারিত হয়ে গেল। (যুবদাহ. আহকামে হাজ্ব- ১০৬ পৃষ্ঠা; দারাকুতনী; তরীকায়ে হাজ্ব- ৭৯ পৃষ্ঠা; হাজ্ব ওয়া মাকামাতে হাজ্ব- ১৪২ পৃষ্ঠা)

ইমাম নাবাবী শারহুল মুহায্যাব গ্রন্থে বলেন, উক্ত হাদীসটি ইবনু 'উমার হতে বর্ণিত; এটাকে বর্ণনা করেছেন আবূ বাক্‌র আলবায্‌যার ও দারাকুতনী এবং বায়হাকী দুটি অত্যন্ত দুর্বল সূত্রের মাধ্যমে। (কিতাবুর রদ্দে আলাল ইখনায়ী- ২৯ পৃষ্ঠা)

ইংরেজী বিশ শতকের শেষার্ধে সাউদী আরবের সবচেয়ে বড় 'আলিম 'আল্লামা শাইখ 'আব্‌দুল 'আযীয ইবনু 'আব্‌দুল্লাহ ইবনু বায (রহঃ) এই হাদীসটিকে জাল হাদীসের মধ্যে গণ্য করেছেন- (আলইযাহ্ অত্তাহ্‌কীক ফী-আহ্‌কামি হাজ্বি বাইতিল্লাহিল আতীক্ব- ১৩০ পৃষ্ঠা)। সুতরাং ঐ জাল হাদীসটি দলীল যোগ্য মোটেই নয়।

মুফতী মুহাম্মাদ শফী বর্ণিত আরো একটি হাদীস এই- কেউ যদি আমার ইন্‌তিকালের পরে আমার ক্ববর যিয়ারত করে তাহলে সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করলো। (যুবদাহ, আহকামে হাজ্ব- ১০৬-১০৭ পৃষ্ঠা)

এই হাদীসটি সম্পর্কে বর্তমান বিশ্বের অতুলনীয় হাদীস বিশারদ ও রিজালবিদ 'আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, এটি বর্ণনা করেছেন ইমাম তাবারানী তদীয় মুজামে কাবীর- ৩য় খণ্ড ২০৩ পৃষ্ঠায় এবং মুজামে আওসাতে ১ম খণ্ড ১২৬ পৃষ্ঠা; আর দারাকুতনী ২৭৯ পৃষ্ঠা ও বাইহাকী- ৫ম খণ্ড ২৪৬ পৃষ্ঠায়। অতঃপর তিনি এর বর্ণনাকারীদের বিভিন্ন দোষত্রুটি বর্ণনার পর বলেন, এই হাদীসটি জাল। (সিলসিলাতুল আহ-দীসিয্ যঈফাহ্ অলমাউযূ আহ্- ১ম খণ্ড ৬২-৬৩ পৃষ্ঠা)

মাওলানা রাবে নদভী একটি হাদীস নকল করেছেন, যে ব্যক্তি হাজ্ব করল, অথচ আমার যিয়ারত করল না সে আমার উপরে যুলুম করল।(হাজ্ব ওয়া মাকামে হাজ্ব- ২৪২)

এই হাদীসটিও জাল। এ কথা বলেছেন, হাফিয যাহাবী মীযানুল ই'তিদাল- ৩য় খণ্ড ২৩৭ পৃষ্ঠায় এবং 'আল্লামা সাগানী আল-আহাদীসুল মাউযুআহ্- ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়। (সিলসিলাতুল আহাদীসিয্ যাঈফাহ্ অল-মাউযুআহ্- ১ম খণ্ড ৬১ পৃষ্ঠা)

অন্য একটি বর্ণনায় আছে- যে ব্যক্তি একই বছরে আমার এবং আমার পূর্বপুরুষ ইবরহীমের যিয়ারত করল, সে জান্নাতে প্রবেশ করল। 'আল্লামা আলবানী বলেন, এই হাদীসটিও জাল। যেমন 'আল্লামা যারকাশী আল্-লাআ-লিল মানসূরার ১৫৬ নাম্বারে এবং ইমাম নাবাবী ও 'আল্লামা সুয়ূতী যাইলুল আহাদীসিল মাউযুআহ্- ১১৯ নাম্বারে এবং ইবনু তাইমিয়াহ্ ও ইমাম নাবাবীর বরাতে ইমাম শাওকানী আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমুআ- ৪২ পৃষ্ঠায় এটাকে জাল হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন। (পূর্বোক্ত সিলসিলাহ্- ১ম খণ্ড ৬১ পৃষ্ঠা)

ক্ববরে যাওয়া ও ব্রেলভী ফাত্‌ওয়া

মুসলমানদের মধ্যে হানাফী মাযহাবপন্থী ব্রেলভী ফির্কার লোকেরা অলী ও বুযুর্গদের মাযারে গিয়ে বাড়াবাড়ি করেন। তাই ক্ববরে যাওয়ার ব্যাপারে

ব্রেলভীপন্থীর প্রতি ষ্ঠাতা মাওলানা আহমাদ রিযা খান (রহঃ)-এর কতিপয় ফাতাওয়া নিম্নে দেয়া হল ঃ

ইমাম কাযীর নিকটে ফাতাওয়া চাওয়া হল যে, নারীদের বিভিন্ন ক্ববরে যাওয়া বৈধ কি না? তিনি বললেন, এরূপ ক্ষেত্রে বৈধ ও অবৈধ জিজ্ঞেস করা হয় না। এটা জিজ্ঞেস কর যে, ওতে মেয়েদের উপর কত লা'নাত তথা অভিসম্পাত হয়?

১। মেয়েরা যখন ঘর থেকে মাযারের দিকে যাবার ইচ্ছা করে তখন তারা আল্লাহ এবং ফেরেশতার লা'নাতের মধ্যে থাকে।

২। যখন তারা ঘর থেকে বের হয় তখন সব দিক থেকে শাইত্বন তাদেরকে ঘিরে ফেলে।

৩। যখন সে ক্ববর পর্যন্ত পৌঁছে যায় তখন মৃতব্যক্তির আত্মা তার উপরে লা'নাত দেয়।

৪। যখন সে ফিরে আসে তখনও সে আল্লাহর লা'নাতে থাকে। (ফাতাওয়া রিযভিয়্যাহ- ৪র্থ খণ্ড ১৭৩ পৃষ্ঠা; মুবারকপুর ইউ.পি. ছাপার বরাতে ইরশাদাতে আ'লা হাযরাত- ৪৪ পৃষ্ঠা)

হানাফী 'আলিম মোল্লা 'আলী ক্বারী মান্‌সাকে মুতাআস্‌সিতে লিখেছেন, তাওয়াফ করা কা'বা ঘরের বৈশিষ্ট্য। তাই নাবী ও অলীদের ক্ববরগুলোর চারদিকে ঘোরা হারাম। (ইরশাদাতে আ'লা হাযরাত- ৫৭ পৃষ্ঠা)

ক্ববরে চেরাগ রাখা সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ। আর অলীদের মাযারগুলোকে তা রাখা আরো বেশী অবৈধ। কারণ ওতে বেয়াদবী ও অসম্মান এবং মৃত ব্যক্তির অধিকারে হস্তক্ষেপ ও বাড়াবাড়ি করা হয়। (ঐ- ৫৮ পৃষ্ঠা)

ক্ববরে সলাত আদায় করা হারাম, ক্ববরের দিকে সলাত আদায় করা হারাম। ক্ববরে পা রাখা হারাম। ক্ববরে মাসজিদ নির্মাণ ও চাষ করা ইত্যাদি হারাম।
(ইরফানে শরীআত- ৩য় খণ্ড ১৮ পৃষ্ঠা; শেষোক্ত- ৬১ পৃষ্ঠা)

ওয়াসীলার প্রয়োজনীয়তা

দুনইয়াদারী ব্যাপারে দেখা যায় যে, বহু কাজ কোনরূপ ওয়াসীলা ছাড়া হয় না। তবে ঐ ওয়াসীলাটা মৃত ব্যক্তি নয়, বরং পদমর্যাদাশীল কোন জীবিত মহান ব্যক্তি হন। কখনো ঐ মাধ্যমটা টাকা-পয়সার রূপে ঘুষ নামক তোহফা হয় কিংবা কোন মূল্যবান দ্রব্যের উপকার হয়।

পরকালে হাশরের মাঠেও শাফা'আতরূপী ওয়াসীলারও প্রয়োজন হবে। কিন্তু ঐ শাফা'আতটা সীমাবদ্ধ আকারে থাকবে। কারণ ঐ শাফা'আত কেবল তারাই করতে পারবে যাদেরকে আল্লাহ শাফা'আত করার অনুমতি দেবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يومئذ لاتنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضى له قولا *

অর্থাৎ– সেদিন শাফা'আতটা উপকার দেবে না। তবে যাকে করুণাময় আল্লাহ অনুমতি দেবেন তিনি ব্যতীত। (সূরা ঃ ত্বহা– ১০৯ আয়াত)

সেই সাথে এটাও জেনে রাখা দরকার যে, ঐ শাফা'আত করার দায়িত্বপ্রাপ্ত কিছু মহান ব্যক্তির শাফা'আতটা সবাই পাবে না। বরং কিছু ব্যক্তি পাবে যাদেরকে শাফা'আত পাবার জন্য আল্লাহ বেছে নেবেন। তাই শাফা'আতের ব্যাপারটা কেবলমাত্র আল্লাহরই ইচ্ছামত হবে। তা সব অলী ও বুযুর্গদের দ্বারা ঢালাওভাবে হবে না। ফলে কোন মানুষই এটা জানতে পারবে না যে, আল্লাহ শাফা'আত করার অনুমতি কাকে দেবেন এবং কাদের জন্য দেবেন? অতএব ওয়াসীলার ব্যাপারটা ঠাণ্ডা মাথায় বোঝা দরকার। অন্যথায় পথভ্রষ্ট ও মুশরিকে পরিণত হবার আশঙ্কা।

বর্তমানে দেখা যায়, মদ খেয়ে চূর বহু মাতাল এবং রকমারী পাপে ভরপুর বহু পাপী ব্যক্তি এমন আছে যারা মনে করে যে, অমুক পীর ও ফকীর এবং বুযুর্গ ও অলীর ওয়াসীলায় তারা পরকালে পার পেয়ে যাবে। তাদেরকে এ দুনইয়াতে ঐসব পাপ ত্যাগ না করলেও চলবে। কারো যদি এই বিশ্বাস জন্মে যায় যে, পরকালে মুক্তির চাবিকাটি অমুক পীরের হাতে আছে এবং অসুখ থেকে আরোগ্যলাভ ও রোযগারে বারকাত ও বৃদ্ধিলাভ অমুক বুযুর্গব্যক্তির ওয়াসীলায় হয়ে থাকে তখন তারা আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে ঐসব বুযুর্গ ও অলীদের পাল্লায় পড়ে এবং তাদের নানারূপ সেবাযত্ন ও শ্রদ্ধাভক্তি করে।

প্রত্যেক একত্ববাদী মুআহ্হিদ এবং বহুত্ববাদী মুশরিক একথা বিশ্বাস করে যে, সৃষ্টি জগতের একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা। কিন্তু এই বিশ্বাসের সাথে সাথে তারা এটাও ধারণা রাখে যে, আল্লাহ সবকিছুর মালিক হলেও কোন ওয়াসীলা ও মাধ্যম ছাড়া তিনি কারো কথা শোনেন না। যেমন আদালাতের বিচারক উকীলের মাধ্যম ছাড়া আসামী ও ফরিয়াদীর কথা শুনেন না। আসমানী কিতাব তাওরাত ও ইন্‌জীলে বিশ্বাসী ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের মধ্যে ওয়াসীলার কারবার খুব জোরেশোরে চলত। আজও তা অব্যাহত আছে। অবতাররূপী মাধ্যমে বিশ্বাসী অমুসলিমরাও মাধ্যমের ফাঁসে জড়িত। তেমনি মুসলমানদের একটি বড় দলও ওয়াসীলা ও মাধ্যমের অনৈসলামিক প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে পরকালের মুক্তি এবং ইহজগতের সমস্যাবলীর সমাধানকল্পে 'বেহাক্কে ফুলাঁ' অর্থাৎ অমুকের অধিকারের দোহাই, 'বেজা-হে ফুলাঁ' অমুকের সম্মানের দোহাই এবং বেহুরমাতে ফুঁলা অমুকের মর্যাদার দোহাই দিচ্ছে। ফলে ইসলামী মতে আল্লাহ ও বান্দার সরাসরি সম্পর্কটা পীর-ফকীর এবং বুযুর্গ অলীর ওয়াসীলার জালে জড়িত আছে। তাই ওয়াসীলার প্রকৃত ব্যাপারটা সবার সামনে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে।

ওয়াসীলার অপপ্রচার ঈমান নষ্টের হাতিয়ার

কেন্দ্রীয় জমঈয়তে আহলে হাদীস হিন্দের সাবেক সভাপতি ও ভারতের বিশিষ্ট 'আলিমে দ্বীন মাওলানা মুখতার আহমাদ নাদভী বলেন, আমার ব্যক্তিগত

অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, একজন অস্ট্রেলিয়ান, খৃস্টান ইঞ্জিনিয়ার পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক গবেষণা করার পর ইসলামের একটিমাত্র গুণের কারণে ইসলাম গ্রহণ করেন। তা হল যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার দু'আ ও প্রার্থনা কোন ওয়াসীলা ও মাধ্যম ছাড়াই শোনেন এবং তা কবূল করেন। তিনি কোন মাধ্যমের মুখাপেক্ষী নন। একজন নগণ্য ও সাধারণ মুসলমানও যখন চায় তখন সে- হে আল্লাহ! বলে তাঁকে ডাকলে তিনি তার ডাকে সাড়া দেন। এভাবে তিনি সবার ডাকে সাড়া দেন এবং তাদের সবারই প্রার্থনা তিনি ক্ববূল করেন। এই ব্যাপারটা ঐ ইঞ্জিনিয়ারের মনে প্রকৃতি মোতাবেক মনে হয়। তাই তিনি ইসলাম ক্ববূল করে মুসলমান হয়ে যান।

কিন্তু কিছুদিন পরে একটি পীরের আস্তানা তথা বড় খানকাহতে তাঁর যাবার সুযোগ ঘটে। সেখানে তাঁকে বলা হয় যে, আপনার ইসলাম গ্রহণটা এখনো সঠিক হয়নি এবং এখনো তিনি কাফিরই আছেন। কারণ এখনো তিনি কোন পীরের কাছে বাই'আত করেননি। তিনি যতক্ষণ কোন পীর ও অলীর হাতে বাই'আত না করবেন এবং তাঁর হুকুম মোতাবেক কোন বুযুর্গকে অসীলা না বানাবেন ততক্ষণ তাঁর ইসলাম গ্রহণটা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তাঁর কোন প্রার্থনা শোনা হবে না। এ বক্তব্য তাঁর মনে ধাক্কা দেয়। ফলে তিনি আবার খৃস্টান হয়ে যান এবং এ কথা বলতে বাধ্য হন যে, যে আল্লাহ অন্যের মাধ্যম ব্যতীত নিজ বান্দাদের ফরিয়াদ শুনতে পারে না তিনি তো আল্লাহ নাম পাবার যোগ্যই নন। আর যে ধর্ম এরূপ ওয়াসীলার শিক্ষা দেয় সেটা তো আসমানী ধর্মই নয়।

(মাশরূ আওর মামনূ ওয়াসীলাহ কী হাক্বীক্বাত- ১৫-১৬ পৃষ্ঠা)

উক্ত দুঃখজনক ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, ওয়াসীলার বেড়াজালে ফেঁসে একজন খৃস্টান নও-মুসলিম ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য হন- ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন! তাই ইসলামী ওয়াসীলার প্রকৃতি কী? তা সবারই জানা একান্ত দরকার। আল-কুরআনে দু'জায়গায় ওয়াসীলার কথা উল্লেখ রয়েছে এবং হাদীসে রসূলের কোথাও কোথাও ওয়াসীলা শব্দ পাওয়া যায়। তাই এখানে প্রথমে আরবী অভিধান দ্বারা ওয়াসীলা শব্দের ব্যাখ্যা করা হল।

ওয়াসীলা শব্দের আভিধানিক অর্থ

'আল্লামা রাগিব ইসপাহানী (মৃত্যু ৫০২ হিজরী) বলেন, 'আল-ওয়াসীলা আত্-তাঅস্সুলু ইলাশ শাইয়ি ব্রিরগ্বাতিন' অর্থাৎ কোন জিনিষের দিকে আগ্রহসহকারে পৌঁছানোকে ওয়াসীলা বলে। (আল-মুফ্রাদাতু ফী গরীবিল কুরআন- ৫২৩)

'আল্লামা ইবনু 'আসীর বলেন, ওয়াসীলা হচ্ছে উদ্দেশ্য সাধনে কারো নৈকট্য লাভ করা এবং আগ্রহসহকারে ঐ পর্যন্ত পৌঁছানো। (আননিহায়াহ্ ফী গরীবিল হাদীস)

সিহাহ্ প্রণেতা 'আল্লামা জাওহারী বলেন, 'আল্-অসীলাহ্ মা-ইয়ুতাক্বাররাবু

বিহী ইলাল গাইর' অর্থাৎ ওয়াসীলা হচ্ছে তা, যদ্দ্বারা অন্যের নৈকট্য লাভ করা যায়। (আত্-তাওসসুল্ ইলা হাক্বীকাতিত তাওস্সুল– ১১ পৃষ্ঠা)

কামূস প্রণেতা 'আল্লামা ফীরোযাবাদী বলেন, 'আল-ওয়াসীলা আল-মান্যিলাহ ইন্দাল মালিকি ০ আদ্দারাজাহ্ ০ অলকুরবাহ' অর্থাৎ– ওয়াসীলাহ্ হচ্ছে বাদশাহর নিকট পদমর্যাদা ও সম্মান এবং নৈকট্য লাভ করা। (ঐ– ১১ পৃষ্ঠা)

উক্ত আভিধানিক অর্থ দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, আরবী ওয়াসীলা শব্দের অর্থ কারো নৈকট্য লাভের মাধ্যম এবং ঐ মাধ্যমটা হচ্ছে কোন বস্তু। দুনইয়াদারীর ক্ষেত্রে ঐ মাধ্যমটা কখনো কোন মানুষ হয় এবং কখনো তা কোন উপঢৌকন হয়। কিন্তু আল্লাহ ও পরকালের ক্ষেত্রে ঐ ওয়াসীলা কী হবে? তার উত্তরে বলা যায় যে, আল্লাহ নিজে ওয়াসীলা শব্দটি আল-কুরআনে দু'জায়গায় ব্যবহার করেছেন। তাই এখন কুরআনের ভাষায় ওয়াসীলার ব্যবহারটা নিম্নে দেখা যাক।

আল-কুরআন ও ওয়াসীলার বিধান

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة وجاهدوافى سبيله لعلكم تفلحون *

অর্থাৎ– হে তারা, ঈমান এনেছ যারা! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর কাছে ওয়াসীলা খোঁজ। আর তাঁর পথে জিহাদ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (সূরা ঃ আল-মায়িদাহ্– ৩৫ আয়াত)

উক্ত আযাতের ব্যাখ্যায় 'আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু জারীর ত্বাবারী (মৃত্যু ৩১০ হিজরী) বলেন, তোমরা তাঁর কাছে ওয়াসীলা খোঁজ এর অর্থ তোমরা তাঁর নৈকট্যলাভের জন্য এমন 'আমাল (ভাল কাজ)-এর খোঁজ কর যেটাকে তিনি পসন্দ করেন। (তাফসীরে ত্বাবারী– ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৩১ পৃষ্ঠা)

বিশিষ্ট তাবিঈ আবূ ওয়ায়িল ও হাসান, মুজাহিদ ও ক্বাতাদাহ্, আতা ও সুদ্দী ইবনু যায়িদ ও 'আব্দুল্লাহ ইবনু কাসীর হতে বর্ণিত যে, ওয়াসীলার অর্থ কুর্বাত তথা নৈকট্যলাভ। (তাফসীরে কুরতূবী– ৬ষ্ঠ খণ্ড ১০৪ পৃষ্ঠা)

বিশিষ্ট সহাবী ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, ওয়াসীলার অর্থ কুরবাত অর্থাৎ নৈকট্য লাভ। তাবিঈ ক্বাতাদাহ্ বলেন, ঐ আয়াতটির অর্থ তোমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ কর তাঁর আনুগত্য দ্বারা এবং এমন 'আমাল ও কাজ দ্বারা যেটাকে আল্লাহ পসন্দ করেন। (তাফসীর ইবনু কাসীর– ২য় খণ্ড ৫৩ পৃষ্ঠা)

উপরে বর্ণিত ওয়াসীলা শব্দের আভিধানিক অর্থ এবং সহাবী ইবনু 'আব্বাস ও তাবিঈ মুজাহিদ ক্বাতাদাহ্ প্রমুখদের ব্যাখ্যা প্রমাণ করে যে, ওয়াসীলার শরী'আতী

ভাবার্থ এমন কোন জিনিস ও 'আমাল যদ্দ্বারা আল্লাহর নৈকট্যলাভ করা যায়। ঐ ওয়াসীলা কোন পীর ও ফকির এবং অলী ও বুযুর্গ ব্যক্তি নয়। আল-কুরআনে সূরা বানী ইসরাঈলেও ওয়াসীলা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ ত'আলা বলেন ঃ

اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون

رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا *

অর্থাৎ- ওরাই তারা যাদেরকে মুশরিকরা ডাকত তারাই তাদের পালনকর্তার কাছে ওয়াসীলার (নৈকট্যলাভের) উপায় খুঁজছে তাদের মধ্যে কে তাঁর বেশী নিকটবর্তী হতে পারে এবং তারা তাঁর দয়া পাবার আশা করছে। আর তারা তাঁর শাস্তির ভয়ও পাচ্ছে। (সূরা ঃ বানী ইসরাঈল- ৫৭ আয়াত)

উক্ত আয়াতেও ওয়াসীলা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে বিশিষ্ট সহাবী ইবনু মাসঊদ বলেন, আরবের কিছু লোক কিছু জ্বিনের পূজা করত। তারপর ঐ জ্বিনরা ইসলাম গ্রহণ করে। এমতাবস্থায় তাদের পূজারী মানুষরা জানতেই পারেনি যে, তাদের পূজনীয় জ্বিনরা আর মুশরিক নেই। বরং তারা ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছে। অতঃপর তারা তাদের পালনকর্তার ওয়াসীলা তথা নৈকট্য লাভের উপায় খুঁজছে। সহাবী ইবনু 'আব্বাস ও তাবিঈ মুজাহিদের ভাষায় ঐ ওয়াসীলাহ্ ছিল জান্নাতের খোঁজ করা। (তাফসীরে কুরতুবী- ১০ম খণ্ড ১৮১)

উপরে উল্লিখিত সূরা ইসরা বা সূরা বানী ইসরাঈলের ৫৭ নং আয়াতে বর্ণিত 'আল-ওয়াসীলা' শব্দের ব্যাখ্যায় সহাবী ইবনু 'আব্বাস ও তাবিঈ মুজাহিদ প্রমুখের উক্তি প্রমাণ করে যে, ওয়াসীলার ভাবার্থ আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যমটা কোন মানুষরূপী পীর-অলী নন। বরং তা হচ্ছে জান্নাতকে খোঁজ করার বস্তু আল্লাহর মনঃপূত কাজ।

হাদীসে বর্ণিত ওয়াসীলা শব্দের ব্যাখ্যা

বুখারী শরীফে জাবির ইবনু 'আব্দুল্লাহর বর্ণনায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আযানের ডাকটা শোনার পর যে ব্যক্তি বলবে-

اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، ات محمدان

الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودان الذي وعدته *

তার জন্য ক্বিয়ামাতের দিন আমার শাফা'আত বৈধ হয়ে যাবে।
(বুখারী, মিশকাত- ৬৫ পৃষ্ঠা)

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনু 'আস এর বর্ণনায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ওয়াসীলাহ্ হচ্ছে জান্নাতের মধ্যে একটি বিশেষ জায়গা।

আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কোন বান্দাই ঐ জায়গার যোগ্য হবে না। তবে আমি আশা করি যে, আমিই ওর যোগ্য হব। তাই যে ব্যক্তি আমার জন্য ঐ ওয়াসীলা চাইবে তার জন্য আমার শাফা'আত বৈধ হয়ে যাবে। (মুসলিম, মিশকাত– ৬৪-৬৫ পৃষ্ঠা)

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)-এর বর্ণনায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ওয়াসীলা হচ্ছে, আল্লাহর কাছে এমন একটা মর্যাদার জায়গা যার উপরে কোন জায়গাই নেই। (ইবনু মারদাওয়াহে. তাফসীর ইবনু কাসীর– ২য় খণ্ড ৫৪ পৃষ্ঠা)

উপরে বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে, ওয়াসীলা একটি জায়গার নাম। তা কোন পীর-ফকীর এবং অলী ও বুযুর্গ ব্যক্তি নন। যেমন মুসলমানদের একটি দল মনে করে যে, পীর ও অলী তাদের ওয়াসীলা এবং আল্লাহর কাছে তাদের নৈকট্য লাভের মাধ্যম। আল্লাহ তাদেরকে ওয়াসীলার প্রকৃত মর্ম বোঝার সুমতি দিন– আমীন!

আগে সহাবী ও তাবিঈ এবং মুফাস্‌সিরে কুরআন মনীষীদের ব্যাখ্যা দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, ওয়াসীলা হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য তাঁরই পসন্দনীয় কোন কাজ। তাই আল্লাহর মনঃপূত কাজের ওয়াসীলার নমুনা নীচে পেশ করা হল।

আল্লাহর পসন্দনীয় কাজের ওয়াসীলার নমুনা

ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত; নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিনজন লোক পায়ে হাঁটছিল। তাদেরকে বৃষ্টি ধরে ফেলে। তাই তারা একটি পাহাড়ের গুহাতে আশ্রয় নেয়। অতঃপর পাহাড়টির একটি বড় শিলাখণ্ড ওদের গুহাটির মুখে পড়ে যায়। ফলে তা ওদেরকে ঢেকে দেয়। তখন তাদের একে অন্যকে বলে, তোমরা তোমাদের এমন কোন নেক 'আমাল ও ভাল কাজ দেখ, যা তোমরা কেবলমাত্র আল্লাহরই উদ্দেশ্যে করেছিলে। ঐ কাজের দোহাই দিয়ে আল্লাহকে ডাক ওর ওয়াসীলায় আমাদের বিপদটা তিনি দূর করে দিতে পারেন।

অতঃপর একজন বলল, হে আল্লাহ! আমার অতি বুড়ো মা-বাবা ছিলেন। আর আমার ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে ছিল। আমি রাখালগিরি করতাম। অতঃপর সন্ধ্যায় যখন ফিরে আসতাম তখন দুধ দুয়ে আমার মা-বাবাকে তা পান করাতাম, আমার সন্তানদেরকে পান করাবার আগে। একদিন একটি গাছের খোঁজ আমাকে দূরে নিয়ে চলে যায়। ফলে আমি (বাড়ি) ফিরতে রাত হয়ে যায়। অতঃপর আমি তাঁদের দু'জনকে পেলাম ঘুমন্ত অবস্থায়। তারপর আমি দুধ দুইলাম, যেমন দুইতাম। অতঃপর আমি দুধটা নিয়ে এসে তাঁদের দু'জনের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে থাকলাম। আমি তাঁদেরকে জাগানোটা অপসন্দ করছিলাম এবং তাঁদের দু'জনের

আগে আমার সন্তানদেরকে দুধ পান করানোটাও অপসন্দ করলাম। অথচ আমার সন্তানরা আমার পায়ের কাছে কান্নাকাটি করছিল। আমার অবস্থা এবং আমার সন্তানদের অবস্থাটা ঐরূপই থাকে। পরিশেষে ফজর (কাকভোর) হয়ে যায়। হে আল্লাহ! তুমি যদি জানো যে, আমি ঐ কাজটা তোমার সন্তুষ্টির খোঁজে করেছিলাম তাহলে তুমি আমাদের জন্য বাঁচার পথ করে দাও। যাতে আমরা আকাশটা দেখতে পাই। ফলে আল্লাহ তা'দের জন্য পাথরটা কিছু সরিয়ে দিলেন। পরিশেষে তারা আকাশটাকে দেখতে পেল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ আমার একটি চাচাতো বোন ছিল। আমি তাকে খুব ভালো বাসতাম যেমন পুরুষরা নারীদেরকে ভাল বাসে। তাই আমি তার দেহকে পাবার জন্য একদিন তাকে প্রস্তাব দিয়েছিলাম। সে অস্বীকার করেছিল। এমনকি আমি তাকে একশো স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলাম। অতঃপর আমি চেষ্টা করতে থাকি। পরিশেষে আমি একশো স্বর্ণমুদ্রা আবার জমা করে ওটা নিয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করি। তারপর আমি যখন তার দুই পায়ের মাঝখানে বসি তখন সে বলে, হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহকে ভয় কর এবং (তুমি আমার সতীত্বের) মোহরটা খুলে ফেল না। অতঃপর আমি তার কাছ থেকে সরে পড়ি। হে আল্লাহ! তুমি যদি জান যে, আমি ঐ কাজটা তোমার সন্তুষ্টির খোঁজে করেছিলাম তাহলে তুমি আমাদেরকে বাঁচাও। ফলে তাদের জন্য গুহার মুখটা তিনি আরো একটু খুলে দিলেন।

তারপর শেষ ব্যক্তিটি বলল, হে আল্লাহ! আমি (ষোল রত্ল তথা ২ মণ) মালের বিনিময়ে একটি মজদুর রেখেছিলাম। অতঃপর সে যখন তার কাজটা শেষ করে তখন সে আমাকে বলে, আমার প্রাপ্যটা আমাকে দিন। আমি তার কাছে তার প্রাপ্যটা পেশ করলাম। কিন্তু সে সেটাকে ছেড়ে চলে যায়। এদিকে আমিও তার থেকে বেখেয়াল হয়ে যাই। তারপর থেকে আমি ঐ মালটাকে চাষ করতে থাকি। পরিশেষে আমি ওখেকে গরুর দল ও তার রাখাল জমা করে ফেলি। তারপর সে আমার কাছে এসে বলে, তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার প্রতি অন্যায় না করে আমার সেই প্রাপ্যটা দিয়ে দাও। আমি বললাম, তুমি ঐ গরুর দল এবং ওর রাখালের কাছে যাও। সে বলল, তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার সাথে ঠাট্টা করা বন্ধ কর। আমি বললাম, আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না। তাই তুমি ঐ গরু এবং ওর রাখালকে নিয়ে নাও। অতঃপর সে ঐ সব নিয়ে চলে গেল। হে আল্লাহ! তুমি যদি জান যে, আমি ঐ কাজটা তোমার সন্তুষ্টির খোঁজ করেছিলাম তাহলে তুমি বাকি বন্ধ ঢাকনাটা খুলে দাও। ফলে আল্লাহ সবটাই খুলে দিলেন।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত– ৪২০-৪২১ পৃষ্ঠা)

উপরের ঘটনাটা পরিষ্কার প্রমাণ করে যে, আল্লাহর মনপুতঃ কাজের ওয়াসীলা কিভাবে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় হয়। এই ঘটনাটি অতীত যুগের অজানা ঘটনা। যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর শেষনাবীকে জানিয়ে দেন তাঁর উম্মাতকে নেক 'আমালের ওয়াসীলা সংক্রান্ত জ্ঞান দেবার জন্য। সহাবায়ি কিরাম যখন নতুন নতুন

মুসলমান হন এবং শির্কের পরিবেশ থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেননি। ফলে অভ্যাসের বশে কখনো কখনো তাঁরা অমুসলমানী ওয়াসীলার দোহাই দিয়ে ফেলতেন এবং পুরনো অভ্যাসের ক্বসম খেয়ে ফেলতেন তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে বলতেন, যে ব্যক্তি ভুল করে লা-ত্ এবং উয্যার ক্বসম খেয়ে ফেলল সে যেন তখনই 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ'বলে তার ভুলধারণটা সংশোধন করে নেয়। (আত্তাঅস্সুল ইলা-হাক্বীকাতিত তাঅস্সুল– ১২২ পৃষ্ঠা)

উক্ত ঘটনাটা শোনার পর কেউ হয়ত এই আপত্তি তুলতে পারে যে, নেক 'আমালের ওয়াসীলা পেশ করার ঐ ঘটনা তো রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগেকার যুগের ঘটনা। তা আমাদের জন্য প্রযোজ্য হবে কেন? তার উত্তর হল এই যে, উক্ত অজানা ঘটনা তো স্বয়ং রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তাঁর উম্মাতকে জানিয়েছেন জ্ঞান দেয়ার জন্য। এই ঘটনা তো ওয়াসীলা সংক্রান্ত আয়াতগুলোর বাস্তব ব্যাখ্যা। (ওয়াসীলা কী হাকীকাত– ৫৮-৫৯ পৃষ্ঠা)

আগেকার উম্মাতের ভাল কাজগুলোও আমাদের জন্য আদর্শস্বরূপ। আমাদের শরী'আতের একটি নীতি এই যে, আগেকার শরী'আত আমাদের জন্যও শরীয়াত, যতক্ষণ আমাদের শরী'আত ঐ শরী'আতকে মানসূখ ও বাতিল না করে দেয়। সে জন্য শরী'আতী ওয়াসীলা দ্বারা আল্লাহর দরবারে ওয়াসীলা চাওয়ার নিয়মকানুন আদম 'আলাইহিস সালামের যুগ থেকে শেষ নাবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত একই রকমভাবে জারী আছে। আল্লাহর একত্ববাদ সংক্রান্ত মূলবিধান সব নাবীরই যুগে একই ছিল। যেমন আল্লাহ তাঁর শেষ নাবীকে বলেন, আমি তোমার আগে এমন কোন রসূলই পাঠাইনি তাঁর কাছে এই প্রত্যাদেশ দিয়ে যে, আমি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেউই নেই। তাই তোমরা আমারই দাসত্ব কর। (সূরা ঃ আল-আম্বিয়া– ৫২ আয়াত; পূর্বোক্ত আত্তাঅস্সুল– ১২৩ পৃষ্ঠা)

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এক অন্ধের দু'আর ওয়াসীলার আবেদন

এক সহাবী 'উসমান ইবুন হানীফ (রাযিঃ) বলেন, একজন অন্ধ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলে, আপনি আমার জন্য দু'আ করুন। যাতে আল্লাহ (আমার অন্ধত্ব দূর করে) আমাকে সুস্থতা দান করেন। তিনি সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যদি চাও তাহলে আমি দু'আ করব। আর তুমি যদি চাও সবর করবে তাহলে ওটা (অন্ধ থাকাটা) তোমার জন্য ভাল হবে। সে বলল, আপনি দু'আ করুন। অতঃপর নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে খুব ভাল করে উযূ করতে বললেন এবং নিম্নের দু'আটি করতে বললেন–

বাংলা উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা ওয়া আতাঅজ্জাহু ইলাইকা

বিনাবিইয়িকা মুহাম্মাদিন নাবিইয়ির রহমাহ ০ ইয়া মুহাম্মাদ ইন্নী আতাঅজ্জাহু বিকা ইলা রব্বী ফী হা-জাতী লিতাক্বযিয়া ০ আল্লা-হুম্মা শাফ্ফিঅ'হু ফিইয়্যা।

অর্থাৎ– হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছি এবং তোমার প্রতি মুখ করছি তোমার নাবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে যিনি দয়ার নাবী। হে মুহাম্মাদ! আমি আপনাকেও আমার পালনকর্তার প্রতি মুখ করাচ্ছি আমার প্রয়োজনে। যাতে আপনি (ওটাকে) পুরণ করিয়ে দেন। হে আল্লাহ! আমার ব্যাপারে এঁর সুপারিশটা কবূল কর। (তিরমিযী, নাসাঈ, মুস্তাদরাক হাকিম)

দু'আর শেষে অন্ধ ব্যক্তিটির চোখে জ্যোতি ফিরে আসে। এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অন্ধ সহাবীটি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে দু'আর আবেদন করেন এবং রসূলুল্লাহর দু'আটিকে ক্ববূল করার জন্য তিনি নিজেও আল্লাহর কাছে দু'আ করেন। তেমনি ঐ অন্ধটির আবেদনে সাড়া দিয়ে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও ঐ অন্ধের ব্যাপারে দু'আ করেন। ফলে আল্লাহ তা'আরা রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দু'আটি ক্ববূল করেন। তাই অন্ধ ব্যক্তিটি ঐ মাজলিসেই চোখের জ্যোতি ফিরে পান।

উক্ত হাদীসটিতে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দু'আকে ওয়াসীলা বানানো হয়েছে। তাঁর ব্যক্তিসত্ত্বা কিংবা তাঁর মানমর্যাদার দোহাইকে ওয়াসীলা বানানো হয়নি। যদি তাঁর ব্যক্তিসত্ত্বা কিংবা তাঁর মান-মর্যাদাকে ওয়াসীলা বানানো হত তাহলে অন্ধ সহাবীটি নিজের ঘরে বসে ঐসবের দোহাই দিয়ে দু'আ করতে পারতেন। তাঁকে রসূলুল্লাহর কাছে আসতে হত না। তিনি ঘরে বসেই বলতে পারতেন, হে আল্লাহ! রসূলুল্লাহর সত্ত্বার কিংবা তাঁর মান-মর্যাদার ওয়াসীলায় আমার চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দাও। সহাবায়ি কিরামের কেউই নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্ত্বার কিংবা তাঁর মান-মর্যাদার ওয়াসীলার কথা জানতেন না। তেমনি অন্ধ সহাবীটির উক্ত ঘটনাকে কোন সহাবী এবং মুহাদ্দিসীনে কিরাম ও মাযহাবপন্থীদের ইমামগণও রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যক্তি সত্ত্বাকে ওয়াসীলা বানানোর উপকরণ ভাবেননি। তাঁরা সবাই নাবীজীর দু'আটিকে অসীলাহ বানিয়েছেন। এখন কেউ যদি এই হাদীসের ভাবার্থকে নিজের মনগড়া উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চায় তা করলে হাদীসটির প্রকৃত ভাবার্থ মোটেই পাল্টে যাবে না। আল্লাহ আমাদেরকে হাদীস বোঝার ঐরূপ জ্ঞান দিন, যেমন জ্ঞান তিনি সহাবায়ি কিরাম ও আগেকার সৎব্যক্তিগণ সালাফ স-লিহীনকে দিয়েছিলেন।

(পূর্বোক্ত আত্তাঅস্‌সুল ইলা-হাক্বীক্বাতিত তাঅস্‌সুল– ১৬০-১৬১ পৃষ্ঠা ও ২৩০-২৩১ পৃষ্ঠা)

মৃত নয়, জীবিত সহাবী– 'আব্বাসের দু'আর ওয়াসীলা

বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে অনাবৃষ্টির সময়ে সহাবায়ি কিরাম রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দু'আর ওয়াসীলায় আল্লাহর কাছে বৃষ্টি চাইতেন। অতঃপর তাঁর ইন্তিকাল হলে তাঁর জীবিত কোন সহাবীর ওয়াসীলায় তাঁরা বৃষ্টি কামনা করতেন।

কারণ, একটি হাদীসে আছে, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষ যখন মারা যায় তখন তার সব 'আমালই বন্ধ হয়ে যায়... ।(মুসলিম, মিশকাত- ৩২পৃঃ)

জীবিত ব্যক্তির দু'আ করাটা একটা 'আমাল। তাই তার মরণের সাথে সাথে এই 'আমালটাও বন্ধ হয়ে যায়। তেমনি নাবীদের ইন্তিকালের পর তাঁদের দু'আ করার 'আমালটাও বন্ধ হয়ে যায়। সে জন্য রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তিকালের পর সহাবায়ি কিরাম তাঁর (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দু'আর ওয়াসীলা না দিয়ে তাঁরই জীবিত কোন সহাবীর দু'আর ওয়াসীলা দিতেন। যেমন আনাস (রাযিঃ) বলেন ঃ সহাবায়ি কিরাম যখন দুর্ভিক্ষগ্রস্ত হন তখন 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) (রসূলুল্লাহর জীবিত চাচা) 'আব্বাস ইবনু 'আব্দুল মুত্তালিব-এর ওয়াসীলা দিয়ে পানি চাইতেন। তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! আমরা আমাদের নাবীকে ওয়াসীলা বানিয়ে তোমার কাছে দু'আ করতাম। ফলে তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দিতে। আর এখন (তাঁর ইন্তিকালের পরে) আমাদের নাবীর (জীবিত) চাচার ওয়াসীলা দিয়ে তোমার কাছে দু'আ করছি। অতএব তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দাও। ফলে তাঁদেরকে বৃষ্টি দেয়া হত।(বুখারী, মিশকাত– ১৩২ পৃষ্ঠা)

উক্ত হাদীসটির ব্যাখ্যায় 'আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, 'উমার (রাযিঃ)-এর উপরোক্ত বক্তব্যের ভাবার্থ এটা কখনই নয় যে, তখন লোকেরা তাদের দু'আতে এরূপ বলতেন, হে আল্লাহ! আমাদের নাবীর মানমর্যাদার কারণে আমাদেরকে বৃষ্টি দাও।

আর এখন তাঁর মৃত্যুর পরে লোকেরা একথা বলতে থাকে– হে আল্লাহ! 'আব্বাস (রাযিঃ)-এর মান-মর্যাদার ওয়াসীলায় আমাদেরকে বৃষ্টি দাও। কারণ এরূপ বলা বিদ'আত। কুরআন ও হাদীসে এরূপ বলার কোন ভিত্তিই নেই। সালফ স্বলিহীন (সহাবী ও তাবিঈ প্রমুখ) এর কেউই এরূপ করেননি।

(মাশরূ আওর মামনূ ওয়াসীলাহ কী হাক্বীক্বাত– ৬২-৬৩ পৃষ্ঠা)

এবার আমাদের জানা দরকার যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা 'আব্বাস (রাযিঃ) তাঁর ঐ দু'আতে কী বলেছিলেন। যুবাইর ইবনু বাক্কার বলেন, 'আব্বাস (রাযিঃ) বলেছিলেন, হে আল্লাহ! বিপদ আপদ কেবল পাপের কারণেই অবতীর্ণ হয়। আর কেবলমাত্র তাওবাহ্‌র দ্বারা তা দূরীভূত হয়। এই সম্প্রদায় আমাকে তোমার দিকে মুখ করিয়েছে তোমার নাবীর সাথে আমার সম্পর্ক থাকার কারণে। আর আমাদের এই হাতগুলো পাপ সহকারে তোমার সামনে তোলা হয়েছে। আর আমাদের কপালগুলো তাওবাহ্ সহকারে তোমার সামনে হেঁট হয়ে রয়েছে। তাই তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দাও। অতঃপর পাহাড়গুলোর মত বৃষ্টিপাত হল। (ফাতহুল বারী– ২য় খণ্ড ৪৯৭ পৃষ্ঠা– নতুন সংস্করণ)

উক্ত দু'আতে 'আব্বাস (রাযিঃ) পাপের স্বীকারকে এবং তাওবাহ্‌কে ওয়াসীলা বানান। যা একটি সৎকাজ। তিনি দু'আ করছিলেন। আর সমস্ত মুসলমানরা তাঁর দু'আতে আমীন, আমীন বলছিলেন। অতঃপর তাঁদের হাতগুলো দু'আর শেষে নীচে নামার আগেই মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়েছিল।

সহাবীদের যুগে জ্যান্ত মহান ব্যক্তির দু'আর ওয়াসীলা

দ্বিতীয় খলীফা 'উমার (রাযিঃ)-এর পরে পঞ্চম খলীফা বিশিষ্ট সহাবী মু'আবিয়াহ (রাযিঃ)-এর যুগে সিরিয়ার দামিশকে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি এক মহান ব্যক্তি ইয়াযীদ ইবনুল আস্‌অদ জুরাশীকে দিয়ে দু'আ করান। ইয়াযীদ আল্লাহর দরবারে হাত তুললে অন্যান্য সবাই হাত তোলেন এবং দু'আ করেন। কিছুক্ষণ পর তুমুল বৃষ্টি হয়। ('আল্লামা ইবনু আসাকির এই ঘটনাটি বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেছেন)

তিনি অন্য একটি সহীহ্ সানাদে আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তা হল এই যে, গভর্নর যাহ্হাক ইবনু কাইস দুর্ভিক্ষের সময় ইস্তিস্‌কা তথা পানি চাওয়ার জন্য বের হন এবং উক্ত ইয়াযীদ ইবনুল আস্‌অদ দ্বারা দু'আ করান। অতঃপর তিনি কেবলমাত্র তিনবার দু'আ করার সাথে সাথে এত বৃষ্টি হতে থাকে যে, লোকেরা ডুবে যাবার আশংকা করতে লাগল।

উক্ত দুটি ঘটনাই প্রমাণ করে যে, পঞ্চম খলীফা মু'আবিয়া (রাযিঃ) ইন্‌তিকাল করা নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ওয়াসীলা বানাননি। বরং তিনি তাঁর যুগে জীবিত এক সৎ ও মহান ব্যক্তি ইয়াযীদ এর দু'আর ওয়াসীলা বানিয়ে নিজেরাও তাঁর দু'আয় শামিল হন। তেমনি খলীফা মু'আবিয়ার এক গভর্ণর যাহ্হাক ইবনু কাইসও নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্ত্বাকে ওয়াসীলা না বানিয়ে ইয়াযীদ (রহঃ)-এর দু'আকে ওয়াসীলা বানান। ফলে তাঁরা সবাই তাঁর দু'আর বারকাতে বৃষ্টিপ্রাপ্ত হন। (পূর্বোক্ত ওয়াসীলাহ্ কী হাক্বিক্বাত– ৬৩ পৃষ্ঠা)

আদম (আঃ)-এর মুহাম্মাদী ওয়াসীলার জাল হাদীস

ইমাম বাইহাকী তাঁর দালায়িলুন নাবূওঅহ গ্রন্থে 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আদম (আঃ) যখন ভুল করে ফেলেন তখন তিনি বলেন– 'ইয়া রব্বী আস্‌আলুকা বিহাক্বি মুহাম্মাদিন ইল্লা মা-গাফারতা লী' অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা! আমি মুহাম্মাদ-এর অধিকারের ওয়াসীলা দিয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। তখন আল্লাহ্ বলেন, হে আদম! তুমি মুহাম্মাদকে কী করে চিনলে? আমি তো তাকে সৃষ্টিই করিনি। তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা। তুমি যখন আমাকে সৃষ্টি করেছিলে তখন আমি আমার মাথাটা তুলে আরশের পায়াতে দেখেছিলাম লিখা আছে– 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্'। ফলে আমি বুঝতে পারি যে, তুমি তোমার নামের সাথে কেবল সেই নামটাকেই মেলাতে পার যে তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি হতে পারে। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে আদম! তুমি সত্যই বলেছ যে, সে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি। এমতাবস্থায় তুমি যখন তার অধিকারের ওয়াসীলা দিয়ে প্রার্থনা করেছ তখন আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। আর মুহাম্মাদ যদি না হত তাহলে আমি তোমাকে সৃষ্টিই করতাম না। এই হাদীসটিকে ইমাম হাকিম বর্ণনা করেছেন। (আত্তাঅস্‌সুল ইলা হাক্বিক্বাতিত্ তাঅস্‌সুল– ২৫১ পৃষ্ঠা)

উপরোক্ত হাদীসটি জাল হওয়ার কারণ– ঐ হাদীসটির বর্ণনাকারী ইমাম হাকিম বলেন, ঐ হাদীসটির বর্ণনাসূত্রে একজন বর্ণনাকারী আছেন 'আব্দুর রহমান ইবনু যায়িদ ইবনু আসলাম। তাঁর সম্পর্কে ইমাম হাকিমই তাঁর রচিত আল-মুদখাল ইলা-মা'র ফাতিস্ সহীহ্ মিনাস সাক্বীম গ্রন্থে বলেন, উক্ত 'আব্দুর রহমান তাঁর পিতা যায়িদ হতে বহু জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ বলেন, হাদীস বিশারদগণ বলেছেন যে, ইমাম হাকিম বহু জাল হাদীসকেও সহীহ্ বলেছেন। যেমন যুরাইব ইবনু সারমালা বর্ণিত হাদীস। যাতে 'অসিইয়্যুল মাসীহ' এর উল্লেখ আছে। সবার মতে ওটা মিথ্যা বর্ণনা। যেমন ইমাম বাইহাকী ও ইবনুজ জাওযী বর্ণনা করেছেন। (ক্বয়িদাহ্ জালীলাহ্– ১৬৯ পৃষ্ঠা)

এরূপ আবূ মুহাম্মাদ আল-মাক্কী এবং আবুল লাইস সামারকান্দীর বর্ণনায় আছে, আদম (আঃ) বলেছিলেন, আল্লাহ-হুম্মা বিহাক্বক্বি মুহাম্মাদিন ইগ্ফিরলী খত্বীআতী... রসূলুল্লাহ।' এই হাদীসটি সূত্রহীন এবং ইয়াহুদী খৃষ্টানদের বর্ণনা, যা দলীলের অযোগ্য। (ঐ– ১৭৫ পৃষ্ঠা)

উক্ত জাল হাদীসটি ছাড়া আর কোন হাদীসেই এ কথার উল্লেখ নেই যে, আরশের পায়াতে লেখা আছে– 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' তাই ঐ জাল হাদীসের ভিত্তিতে কোন গায়েবী খবর প্রমাণিত হতে পারে কি? (আত্তাঅস্সুল– ২১৮ পৃষ্ঠা)। না মোটেই নয়।

আল-কুরআন এবং বহু সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আদম 'আলাইহিস সালামের ভুলটা তাঁর ক্ষমা চাওয়ার কারণে এবং তাওবাহ্ ও কান্নাকাটির দরুণ মাফ হয়েছিল। শেষ নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যক্তি সত্ত্বাকে ওয়াসীলাহ্ করার কারণে তাঁর ভুলের ক্ষমা হয়নি। কুরআন দ্বারা বোঝা যায় যে, নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার ভুলের পরে আদম 'আলাইহিস সালাম তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে কতিপয় শব্দ শিখে নিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি ঐ শব্দগুলো বলে ক্ষমাপ্রার্থনা করার কারণে আল্লাহ্ তাঁর তাওবাহ্ ক্ববূল করেন।

انه هو التواب الرحيم *

নিশ্চয়ই তিনি তাওবাহ্ ক্ববূলকারী করুণাময়। (সূরা ঃ আল-বাক্বারাহ্– ৩৭ আয়াত)

বিশিষ্ট তাবিঈ মুজাহিদ ও সাঈদ ইবনু যুবাইর, আবুল আ-লিয়াহ্ ও রবী ইবনু আনাস, ক্বাতাদাহ্ ও কা'ব ইবনুল কুরাযী, খালিদ ইবনু মা'দা-ন ও আ্তা খুরাসানী এবং 'আব্দুর রহমান ইবনু যায়দ ইবনু আসলাম প্রমুখের বর্ণনায় ঐ শব্দগুলো ছিল–

ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفرلنا وترحمنا لنكونن من الخسرين *

বাংলা উচ্চারণ ঃ রব্বানা যলাম্না আনফুসানা ওয়া ইন্ লাম তাগ্ফির লানা অতারহামনা লানাকূনান্না মিনাল খ-সিরীন।

অর্থাৎ– হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আমাদের নিজেদের উপরে অত্যাচার করে ফেলেছি। এমতাবস্থায় তুমি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না কর এবং আমাদের প্রতি দয়া না কর তাহলে আমরা অবশ্য অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (সূরা ঃ আল-আরাফ– ২৩ আয়াত; তাফসীর ইবনু কাসীর– ১ম খণ্ড ৮২ পৃষ্ঠা)

তাই আদম (আঃ)-এর ভুলের ক্ষমা পাবার ওয়াসীলা ছিল আল্লাহর শেখানো কতিপয় শব্দ সম্বলিত দু'আ। পূর্বোক্ত জাল হাদীস অনুযায়ী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যক্তিসত্ত্বা তাঁর ভুল মাফের ওয়াসীলা মোটেই ছিল না।

ঐ জাল হাদীসের শেষের বাক্য– 'লাও লা মুহাম্মাদুন মা খালাক্বতুকা' অর্থাৎ– 'মুহাম্মাদ না হলে আমি তোমাকে সৃষ্টিই করতাম না' শব্দগুলোও মিথ্যা কথা আল্লাহর বিরুদ্ধে এবং তাঁর রসূলের নামে, আর আদম (আঃ)-এর নামে। তাই এই জাল হাদীস দ্বারা যে ব্যক্তি দলীল গ্রহণ করবে সে মিথ্যা দ্বারা দলীল পেশ করবে। (আত্তাঅসসূল ইলা-হাক্বাক্বাতিত তাঅস্সুল– ২১৯ পৃষ্ঠা)

উক্ত জাল হাদীসের মত অন্য একটি বর্ণনায় আছে– 'লাও্লা-ক্ লামা-খলাক্বতুল আফলা-ক্' অর্থাৎ– হে মুহাম্মাদ! তুমি যদি না হতে তাহলে আমি আকাশমণ্ডলীকে সৃষ্টি করতাম না। বিশিষ্ট হানাফী 'আলিম 'আল্লামা মোল্লা 'আলী ক্বারী বলেন, 'আল্লামা সগানী খুলা-সহ গ্রন্থে বলেছেন, ঐ হাদীসটি জাল হাদীস।

(মাউযুআতে কাবীর– ৫৯ পৃষ্ঠা)

আমার মর্যাদার ওয়াসীলা দাও– জাল হাদীস

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রহঃ) বলেন, কিছু মূর্খ ব্যক্তি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন– 'ইযা-সাআল্তুমুল্লা-হা ফাস্আলূহু বিজা-হী ০ ফা ইন্না জা-হী ই'নদাল্লাহি আ'যীম'। অর্থাৎ– যখন তোমরা আল্লাহর কাছে চাইবে তখন আমার মান মর্যাদার ওয়াসীলা ও দোহাই দিয়ে তা চাইবে।

এই হাদীসটা মিথ্যা। হাদীস বিশারদগণ যেসব গ্রন্থাবলীকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন তার কোন গ্রন্থেই এই হাদীসটি নেই। যদিও এ কথাটা ঠিক যে, সমস্ত নাবী ও রসূলদের মানমর্যাদার তুলনায় মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মানমর্যাদা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশী। (ক্বায়িদাহ্ জালীলাহ ফিত্ তাআস্সুল অল-ওয়াসীলাহ্– ২৫২ পৃষ্ঠা)

ক্ববরবাসীর ওয়াসীলার জাল হাদীস

ইমাম বাইহাকী ও ইবনু আবী শাইবাহ্ বর্ণনা করেছেন যে, 'উমার (রাযিঃ)-এর খিলাফাত যুগে লোকেরা যখন দুর্ভিক্ষগ্রস্ত হন তখন নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সহাবী বিলাল ইবনু হা-রিস নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়াসাল্লামের স্বপ্নের মধ্যে তাঁর কাছে এলেন এবং এই খবর দিলেন যে, তাদেরকে অতিশীঘ্রই বৃষ্টি দেয়া হবে।

উক্ত হাদীসটির ব্যাখ্যায় 'আল্লামা মুহাম্মাদ নাসীব আর রিফায়ী' বলেন, আল্লাহ বলেছেন–

وما انت بمسمع من فى القبور *

অর্থাৎ– তুমি তাকে শোনাতে পার না যারা ক্বরগুলোতে আছে।

(সূরা ঃ আল-ফাতির– ২২ আয়াত)

উক্ত হাদীসে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্বরের উল্লেখ আছে। তাই হাদীসটির বক্তব্য সঠিক নয়।

হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী উক্ত হাদীসটিকেই সহীহ্ সানাদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাতে একজন লোক এসেছিল শব্দ আছে। তিনি যে সহাবী তার উল্লেখ নেই। তাই আগের হাদীসটিতে বর্ণিত বিলাল ইবনু হারিস এর নামটা ঠিক কিনা সন্দেহ। আর সন্দেহ দ্বারা বর্ণিত হাদীসটির বক্তব্য সঠিক কিনা প্রমাণিত হয় না। মুসন্নফফুতুহ অররিদ্দাহ নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, সাইফ ইবনু 'উমার আয্যব্বী আল আসাদী স্বপ্ন দেখা লোকটির নাম বিলাল ইবনু হারিস বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু রিজালবিদ দাঊদ বলেন, সাইফ লোকটি ফালতু লোক। আবূ হাতিম বলেন, ঐ লোকটি পরিত্যাজ্য। ইবনু হিব্বান বলেন, ঐ লোকটি যিনদীক ও বিধর্মী হবার অপবাদে দুষ্ট। তাই ঐ জাল হাদীসটি দলীল যোগ্য নয়।

(আত্তাঅসসুল্ ইলা হাক্বীক্বাতিত তাঅস্সুল– ২৪৮-২৫২ পৃষ্ঠা)

উপরে বর্ণিত কতিপয় জাল হাদীস ছাড়াও আরো কিছু জাল হাদীস আছে। যদ্দ্বারা ওয়াসীলার দোহাই দানকারীগণ এমন ওয়াসীলা গ্রহণ করে থাকে। যা ইসলামী শরী'আত বিরোধী। তাই বলে সবরকম ওয়াসীলাই নিষিদ্ধ নয়। সে জন্য আমাদেরকে জানতে হবে যে, কোন্ ওয়াসীলা বৈধ ও শরী'আত সম্মত এবং কোন্ ওয়াসীলা কুরআন ও সহীহ্ হাদীস মতে অবৈধ এবং নিষিদ্ধ।

কুরআন ও হাদীস সম্মত ওয়াসীলার বিবরণ

কুরআন ও হাদীসসম্মত ওয়াসীলা তিন প্রকার। যথা ঃ

১) আল্লাহর মহান সত্ত্বার দোহাই দিয়ে কিছু চাওয়া। তাঁর উত্তম নামের দোহাই দিয়ে কিছু চাওয়া। তাঁর মহান গুণাবলীর দোহাই দিয়ে কিছু চাওয়া। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

* ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها *

অর্থাৎ– আল্লাহর বহু উত্তম নাম রয়েছে। তোমরা ঐগুলোর দোহাই দিয়ে তাঁকে ডাক। (সূরা ঃ আল-আ'রাফ– ১৮০ আয়াত)

২) কোন ঈমানদার ব্যক্তির নিজের ভাল কাজের দোহাই দিয়ে আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া। যেমন এর আগে গুহার মুখ বন্ধ হওয়া তিন ব্যক্তির ভাল কাজের দোহাই দিয়ে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

৩) কোন ঈমানদার ব্যক্তির নিজ বিপদে অন্য জীবিত ঈমানদার ব্যক্তির কাছে দু'আর আবেদন করে তাঁর দু'আতে নিজে শামিল হয়ে আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া। যেমন দুর্ভিক্ষের বিপদ দূরীকরণের জন্য দ্বিতীয় খলীফা 'উমার (রাযিঃ) রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবিত চাচা 'আব্বাস (রাযিঃ)-এর মাধ্যমে দু'আ করিয়ে ঐ দু'আতে উপস্থিত ঈমানদারদের শরীক হওয়া।

নিষিদ্ধ ওয়াসীলার বিবরণ

কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ ওয়াসীলাও তিন প্রকার ঃ

১) কারো ব্যক্তি সত্ত্বাকে ওয়াসীলা হিসেবে আল্লাহর কাছে পেশ করা। যেমন ওয়াসীলা গ্রহণকারীর একথা বলা– হে আল্লাহ! আমি অমুক ব্যক্তিকে তোমার কাছে ওয়াসীলা হিসেবে পেশ করছি। ওর ওয়াসীলায় আমার প্রয়োজনটা পুরো করে দাও।

২) কোন ব্যক্তির মর্যাদা, কিংবা তাঁর অধিকার, অথবা তাঁর সম্মান, কিংবা তাঁর বারকাতকে ওয়াসীলা হিসেবে আল্লাহর কাছে পেশ করা। যেমন, ওয়াসীলা পেশকারীর এ কথা বলা, আমি তোমার নিকটে অমুক ব্যক্তির মর্যাদাকে অথবা তোমার কাছে তাঁর প্রাপ্য অধিকারকে, কিংবা তাঁর সম্মান অথবা তাঁর বারকাতকে ওয়াসীলা হিসেবে পেশ করছি। ওর ওয়াসীলায় তুমি আমার এই অভাবটা দূর করে দাও।

৩) কারো ওয়াসীলা দিয়ে আল্লাহর শপথ করা। যেমন ওয়াসীলা পেশকারীর এ কথা বলা– হে আল্লাহ! অমুকের দোহাই দিয়ে আমি তোমার শপথ খাচ্ছি, যাতে তুমি আমার অভাবটা পুরো করে দাও।

(আত্তাঅসসুল ইলা-হাক্বিক্বাতিত তাঅস্সুল– ১৭৭ পৃষ্ঠা)

ওয়াসীলা চাওয়া ও হানাফী ফাতাওয়া

হানাফী ফিক্‌হ গ্রন্থে আছে, বিশ্‌র ইবনু ওয়ালীদ বলেন, আমাদেরকে আবূ ইউসূফ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আবূ হানীফা বলেছেন, কারো জন্য সঙ্গত নয়, আল্লাহকে তাঁর উত্তম নামের ওয়াসীলা ছাড়া অন্য কারো ওয়াসীলা দিয়ে ডাকা। আর আমি আপত্তিকর মনে করি এ কথা বলা যে, আমি তোমার আরশের মানমর্যাদা কিংবা তোমার সৃষ্টির প্রাপ্য অধিকারের ওয়াসীলা দিচ্ছি। এটা ইমাম আবূ ইউসূফেরও কথা। আর আমি এ কথা বলাও আপত্তিকর মনে করি যে, হে আল্লাহ! আমি অমুকের অধিকারের দোহাই, কিংবা তোমার নাবীদের হাক্ব এর দোহাই ও তোমার রসূলদের দোহাই, আর বাইতুল হারাম কা'বার দোহাই এবং মুযদালিফার মাশআরুল হারামের দোহাই দিয়ে বলছি। (আদ্‌দুর্‌রুল মুখতার– ২য় খণ্ড ৬৩০ পৃষ্ঠা; ফাতাওয়া হিন্দিইয়্যাহ ওরফে ফাতাওয়া আলমগিরী– ৫ম খণ্ড ২৮০ পৃষ্ঠা)

হানাফী ফকীহ্ আবূল হুসাইন আল-কুদূরী তাঁর বিরাট ফিক্‌হ গ্রন্থ শারহুল কারখীতে বলেন, (ইমাম) আবূ হানীফা বলেছেন, কোন সৃষ্টিজীবের ওয়াসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে চাওয়া বৈধ নয়। এ কথাও যেন কেউ না বলে, আমি তোমার নাবীদের ওয়াসীলা দিয়ে চাচ্ছি। (কায়িদাহ্ জালীলাহ্ ফিত তাঅস্‌সুল অল-ওয়াসীলাহ্– ৮২পৃঃ)

হানাফী ফকীহ্ 'আল্লামা কুদূরী বলেন, আল্লাহর সৃষ্টিজীবের দোহাই দিয়ে চাওয়া অবৈধ। কারণ, সবারই মতে সৃষ্টিকর্তার উপরে কোন সৃষ্টির কোন অধিকারই নেই। (ঐ– ৮৩ পৃষ্ঠা)

ইবুন বালাজী শারহুল মুখতারে বলেন, আল্লাহর কাছে কেবল তাঁরই নামের দোহাই দিয়ে চাওয়া যাবে। এ কথা বলা যাবে না যে, হে আল্লাহ! তোমার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছি তোমার ফেরেশতাদের কিংবা তোমার নাবীদের ওয়াসীলা দিয়ে। কারণ সৃষ্টিজীবের কোন অধিকারই নেই সৃষ্টিকর্তার উপরে। (পূর্বোক্ত– আত্তাঅসসুল– ১৮৫ পৃ)

হানাফী বিদ্বান 'আল্লামা খাইরুদ্দীন জিলা-উল আইনাইন গ্রন্থে এবং 'আল্লামা আলায়ী শারহুত তানভীর আনিত তাতার্‌খা-নিয়াহ গ্রন্থে বলেন, আবূ হানীফা বলেছেন, আল্লাহকে তাঁর নামের দোহাই ব্যতীত অন্যের দোহাই দিয়ে ডাকা যাবে না। সমস্ত ফিক্‌হে আছে– ওয়াসীলা গ্রহণকারীর পক্ষে নাবীদের এবং ওয়ালীদের দোহাই দেয়া, আর বাইতুল হারাম এর ওয়াসীলা দেয়া হারাম। এটা এমনই হারাম যার শাস্তি জাহান্নাম। (ঐ– ১৮৫ পৃষ্ঠা)

আল-হামদুলিল্লাহ তাম্মাত বিল খাইর